স্বর্ণমৃগ

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭

এক

চোখ তুলে তাকাল রানা।

'করাচি?'

স্থির হয়ে বসে আছেন পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের কর্ণধার মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। ধনুকের ছিলার মত টান টান, লম্বা, ঋজু দেহ। দৃষ্টিতে ক্ষুরের ধার। পুরু বেলজিয়াম কাঁচ ঢাকা মস্ত সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওধারে পিঠ-উঁচু রিভলভিং চেয়ারে বসে আছেন তিনি। মৃদু হাসলেন।

'হ্যাঁ। এবার গোল্ড স্মাগলিং।'

'আমরা কেন, স্যার? পুলিসের কাজ না?'

হাডসন হাভানার প্যাকেট থেকে একখানা সেলোফেন মোড়া চুরুট বের করলেন বৃদ্ধ। সযত্নে কাগজ ছাড়িয়ে দাঁতে চেপে ধরে অগ্নিসংযোগ করলেন। পাতলা সাদা একফালি ধোঁয়া চোখে যাওয়ায় চোখ দুটো পেঁচিয়ে উপর দিকে ঘুরিয়ে আঙুলের ফাঁকে নিলেন চুরুটটা। তারপর দৃষ্টি রাখলেন রানার চোখে।

'সোনা আসছে মিড্‌ল্‌-ঈস্ট থেকে। পুরো চ্যানেল ক্লোজ করতে হবে। কাজেই ব্যাপারটা কয়েক হাত ঘুরে আমাদের হাতে এসেছে। স্ম্যাশ করতে হবে এমন একজন লোককে যে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এ কাজটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে ঢাকা থেকে আমাদের একজনকে পাঠাতে হচ্ছে।'

'লোকটাকে যদি চেনাই যায়, তাহলে···'

'কেউ চেনে না তাকে। অদ্ভুত ধূর্ত এক কৌশলী আর ক্ষমতাশালী লোক আছে এর পেছনে, যাকে কোনমতেই মুখোশ খুলে টেনে আনা যাচ্ছে না অন্ধকার থেকে আলোয়। এই ফাইলটা পড়লেই সব বুঝতে পারবে।'

একটা মোটা ফাইলের মধ্যে লাল ট্যাগ আঁটা। তাতে ইংরেজিতে লেখা 'টপ সিক্রেট'। ফাইলটা ধড়াশ করে ফেললেন রাহাত খান রানার সামনে টেবিলের উপর। প্রচুর ঘাটাঘাটির ফলে কাভারটা নরম হয়ে এসেছে। কিনারা ছিঁড়ে গেছে দু'এক জায়গায়।

'এটা মন দিয়ে পড়ো গিয়ে। পরে ডাকব আবার আমি। আজ অনেক কাজ। কখন সময় পাব ঠিক বলতে পারছি না। যদি অফিস আওয়ার পার হয়ে যায় সিনক্রাফোনটা সাথে রেখো।'

'আচ্ছা, স্যার।'

'এখন আর কোন কথা নেই। যেতে পারো।'

আস্তে দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে নিজের কামরায় যাচ্ছিল রানা ফাইলটা তুলে

নিয়ে। খোলা দরজা দিয়ে রানাকে দেখতে পেয়ে হৈ-হৈ করে ডাকল চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কর্নেল শেখ।

'আরে এসো, এসো! অত ব্যস্ত হবার কি আছে?' রানার হাতের ফাইলটা দেখে বলল, 'আমি জানতাম, তোমাকেই গছাবে ফাইলটা।'

'বুড়োকে ভারী সিরিয়াস মনে হচ্ছে?' একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল রানা।

'ভয়ানক। গত দশ দিন ধরে এ ছাড়া অন্য চিন্তা নেই মাথায়। অন্তত একশো জন লোককে ডেকেছে নানান ডিপার্টমেন্ট থেকে। গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর কি করেছে আল্লামালুম। শেষে আজ আমাকে হুকুম করেছে তোমাকে তলব করবার জন্যে।'

'সাধারণ একটা গোল্ড স্মাগলার···'

'সাধারণ নয়!' বাধা দিল কর্নেল শেখ। 'সাধারণ ব্যাপার নিয়ে আমরা ডীল করি না। আমি যদ্দুর জানি, এবার যদি ভালয় ভালয় ফিরে আসতে পারো, জানবে মস্ত ফাঁড়া কাটল।'

'থ্রী কাস্‌ল্‌স'-এর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে নিল কর্নেল শেখ। কারও অর্ডার ছাড়াই যখন দু'কাপ কফি এসে হাজির হলো, তখন রানা বুঝল খামোকা গল্প করবার জন্যে তাকে ডাকেনি কর্নেল, ব্যাপারটা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। মুখে কিছুই বলল না সে। কফিতে চুমুক দিয়ে চেয়ে থাকল শেখের মুখের দিকে।

'সাধারণ হলে আর তোমাকে ঢাকা থেকে করাচি দৌড়াতে হত না। লোকটা এতই ক্ষমতাশালী যে আমাদের করাচি-ব্রাঞ্চকে পর পর তিনজন অপারেটর হারাতে হয়েছে।'

'খুন?'

'তবে আর বলছি কি? দুই-এক কদম অগ্রসর হলেই খতম করে দিচ্ছে বিনা দ্বিধায়। তোমাকে পাঠাবার পেছনে সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে এই যে তোমাকে চেনে না ওরা। বীচ লাগজারি হোটেলে ধনীর দুলাল সেজে উঠতে হবে তোমাকে। তাড়াহুড়ো করে কিছুই করা চলবে না। এমন কি বরাবরের মত একবারও রিপোর্ট করতে হবে না তোমাকে করাচি অফিসে। যেন কোন ভাবেই টের না পায় ওরা যে এই কাজে গিয়েছ তুমি।'

'এত ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় কেন? একটা লোক···'

'চিনতে পারলে তো একটা লোক!' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল কর্নেল শেখ, 'এখন সে একটা অদৃশ্য শক্তি। যে-কেউ যে মতলব নিয়েই লাগুক না কেন পিছনে, আশ্চর্য উপায়ে টের পেয়ে যাচ্ছে সে, আর অনায়াসে নিষ্কণ্টক করে ফেলছে রাস্তা। এখানে বসে তুমি কিছুই বুঝতে পারবে না। ওখানে গেলেই টের পাবে কতখানি শক্তিধর সে। রঙ্গমঞ্চে ওর ছায়াও দেখতে পাবে না—অথচ সে-ই হিরো।'

'ভয় দেখাবার চেষ্টা করছ কেন খামোকা? তোমারও দেখছি বুড়োর রোগে ধরেছে—কোনও কাজে পাঠানোর আগে চোদ্দবার বলবে, সাবধান! আমাকে কি কচি খোকা পেয়েছ যে জুজুর ভয় দেখাচ্ছ?'

'অন্যান্যদের তুমি চিনবে না, রানা। কিন্তু একজনের নাম বললেই তুমি

ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পারবে। তোমার সাথে কয়েকটা মিশনে ছিল। সিন্ধি ছেলে...'

'আলতাফ!'

'হ্যাঁ। কেউ ছুরি দিয়ে ওর সারা শরীর কেচেছে মোরোব্বার মত। তিন দিন পর ফুলে ভেসে উঠেছে লাশ কেমাড়িতে। সাগরের ঢেউ এসে ফেলে গেছে মৃতদেহটা তীরে। বীভৎস সে দৃশ্য। ছবি দেখতে পারো।'

একটা ছবি বের করে দিল কর্নেল শেখ ড্রয়ার থেকে। সত্যিই বীভৎস দৃশ্য। অনায়াসে চিনতে পারল রানা ওর গলার তাবিজ দেখে। মনে পড়ল বিদ্যুৎগতি সেই সিন্ধি যুবকটির কথা। ছ'ফুট লম্বা, পেটা শরীর। একসাথে পাশাপাশি বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়েছে ওরা বিপদের মুখোমুখি। রানা বুঝেছিল, কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে তার সমকক্ষ যদি কেউ থাকে তবে এই আলতাফ। সেই বুদ্ধিমান করিৎকর্মা ছেলেটির এই দশা যে করতে পারে সে নিশ্চয়ই অবহেলার পাত্র নয়। কঠিন হয়ে উঠল রানার মুখ, দৃঢ় একটা প্রতিজ্ঞার ছাপ ফুটে উঠল সে-মুখে স্পষ্ট। ধীরে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল ছবিটা।

'আমি যাব করাচি।'

মৃদু হাসি কর্নেল শেখের ঠোঁটে। সিগারেটটা ফেলে দিল অ্যাশট্রেতে।

'এবার বুঝতে পারছ গুরুত্বটা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'শুধু এ নয়, আরও দু'জন ছেলেকে হারিয়েছি আমরা। একজনকে খুন করা হয়েছে দিন দুপুরে ম্যাকনিওড রোডের উপর। ছাতের ওপর থেকে কেউ মস্ত একটা পাথর ফেলে থেঁতলে মেরেছে ওকে ফুটপাথের ওপর। আর তৃতীয় জন...'

'আচ্ছা, সেই অদৃশ্য লোকটির সম্পর্কে কোনও তথ্যই জানা যায়নি যাতে তাকে খুঁজে বের করার কাজে কিছুমাত্র সাহায্য হতে পারে?'

'উহুঁ। কিচ্ছু না। ভিট্ আয়ল্যাণ্ডের সাধারণ স্মাগলার সে নয়, এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায়। অল্পদিন হলো নেমেছে সে এই লাইনে, এরই মধ্যে সব্বার মাথার ওপর উঠে গেছে। ছোটখাট গোল্ড স্মাগলার ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে এর চেল্যা হয়ে গেছে। হিউজ স্কেলে কারবার চলছে এখন।'

'আমাকে এগোতে হবে কোন্ সূত্র ধরে? ওদের দলে ঢোকার চেষ্টা করব?'

'ওসব করে কোনও লাভ নেই। আপাতত কিছুদিন তুমি বীচ লাগ্জারী হোটেলে থাকবে নিষ্ক্রীয় ভাবে। আমরা যখন বুঝব যে তার চোখে তুমি পড়োনি, তখন এখান থেকে লাইন-অভ-অ্যাকশন জানিয়ে প্রসিড করতে বলা হবে তোমাকে। আর যদি দেখা যায় টের পেয়ে গেছে ওরা, তাহলে অ্যাবাউট টার্ন করবে। তখন অন্য পথে এগোব আমরা।'

কফিটা শেষ করে উঠে দাঁড়াল রানা।

'থ্যাঙ্ক ইউ, শেখ।'

'অলওয়েজ মেনশন্।'

বেরিয়ে গেল রানা ঘর থেকে।

মোটা ফাইলটা বগলে চেপে ছ'তালায় নিজের কামরায় ঢুকেই অবাক হয়ে গেল

রানা। সোহেল। রানার চেয়ারে আরাম করে বসে জুতো সুদ্ধ দুই পা তুলে দিয়েছে সে টেবিলের উপর। ডান পা-টা প্রবল বেগে নাচাচ্ছিল, রানাকে দেখে নাচ বন্ধ করে সেটা দিয়ে একটা চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করল। গম্ভীর, চিন্তান্বিত মুখে রাহাত খানের অনুকরণে বলল, 'বোসো। তোমার জন্যে একটা অ্যাসাইনমেন্ট...'

হঠাৎ এতদিন পর সোহেলকে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে ছুটে গিয়ে ওর কান ধরল রানা। মুখে বলল, 'এক লাত্ মেরে স্টেডিয়ামের মাঠে নামিয়ে দেব, শালা। ওপর-আলার সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় জানো না? দাঁড়াও, তোমার চাকরি খেয়ে দিচ্ছি আমি।'

সোহেলও ক্যাঁক্ করে চিমটে ধরেছে রানার পেটের চামড়া। বলল, 'কান ছাড়, শালা উল্লুকে পাট্ঠা। ভাল হবে না বলে দিচ্ছি।'

'তুই আগে পেট ছাড়!'

'তুই আগে ধরেছিস। তুই আগে ছাড়বি। ছাড়লি?'

'আগে পেট ছাড়।'

'কান ছাড়।'

আরও কতক্ষণ চলত বলা যায় না। হঠাৎ দরজার সামনে রানার স্টেনো নাসরীন রেহানাকে ইউ. এন. ও.-র মত অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দু'জনই লজ্জা পেয়ে গেল। বিনা বাক্যব্যয়ে যুদ্ধ-বিরতি ঘোষণা করে বসে পড়ল যেন তাসখেন্দ বৈঠকে। রেহানার উপর হুকুম হলো দু'কাপ কফি সাপ্লাইয়ের।

'তুই হঠাৎ কোত্থেকে, দোস্ত? ডাক-বাংলোর বেয়ারার কাজ ছেড়ে দিয়ে শুনলাম ক'দিন রেল-ইস্টিমারে স্বপ্নে পাওয়া দাঁতের মাজন আর খুজলি-পাঁচড়ার মলম বিক্রি করছিলি। ছেড়ে দিলি নাকি সে বিজনেস?'

নিঃশব্দে হাসল সোহেল।

'স্পেশাল মেসেঞ্জ পাঠিয়ে ডেকে আনা হয়েছে আমাকে হেড কোয়ার্টারে, তা জানিস? তোরা তো শালা এক-একটা অকম্মার ধাড়ি, তাই আমাকে ছাড়া চলল না। এখন থেকে আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে তোদের, বুঝলি?'

'এটা দেখেছিস্?' হাতের মোটা ফাইলটা টেবিলের উপর রাখল রানা। 'সাঙ্ঘাতিক একটা অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছি। তুই তো সে তুলনায় নস্যি। তোকে বড়জোর ডেকে এনে একটা দোকানের সেলস্‌ম্যান বানিয়ে দিতে পারে। আর আমাকে পাঠাচ্ছে...'

'করাচি।'

'তুই জানলি কি করে?'

'ওই তো মজা! যে ফাইল অত গর্ব করে দেখাচ্ছিস, জেনে রাখিস, শ্যালক প্রবর, ওতে তোর আগে আমার সই পড়েছে। এবং তোর আগে আমাকেই পাঠানো হচ্ছে সেখানে। বললাম না, আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করা ছাড়া তোদের আর গত্যন্তর নেই।'

'কি আছে ফাইলে?'

'ওই ফাইল পড়ে বিশেষ কিছু লাভ হবে না। ওতে যা আছে তা তিন লাইনে মুখেই বলে দিতে পারি আমি। তবু হুকুম যখন হয়েছে, পড়তেই হবে তোকে।

কিন্তু, দোস্ত, ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস। তোর ওই অপারেশন গুড-উইলের চেয়েও। জেনে খুশি হবি, এই 'স্বর্ণমৃগ' অ্যাসাইনমেন্টটাও তোরই। আমাকে পাঠানো হচ্ছে তোর বস্ হিসেবে তোকে সাহায্য করবার জন্যে। আর খোদা চাহে তো যদি পটল তুলিস, সেজন্যে আমি থাকছি স্ট্যাণ্ড বাই।'

'তুই রওনা হচ্ছিস কবে?'

'কাল সকাল সাড়ে দশটার ফ্লাইটে।'

'রাতটা চল্ আমার ওখানে থাকবি আজ।'

'উহুঁ। সেটা সম্ভব না। অফিসের বাইরে কারও সঙ্গে দেখা করা নিষেধ।'

'তবে মরগে যা, শালা।'

'তার আগে কফিটা খেয়ে নিলে হয় না?'

ধূমায়িত কফির কাপ নামিয়ে রাখল রেহানা টেবিলের উপর।

রেহানা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই সেদিকে ইঙ্গিত করে সোহেল বলল, 'সুখে আছ সখা আপন তালে। অর্ডার দিলেই কফি! তোদের এককেটাকে ধরে না···'

'আরে রাখ, রাখ। এসব চাপা জাহেদের কাছে গিয়ে মার, আমার কাছে না। কেন, অর্ডার দিতেই তুই ছুটে গিয়ে কফি আনিসনি আমার জন্যে?'

হাসল সোহেল। 'সত্যিই, দোস্ত, দারুণ দেখিয়েছিস তুই টিটাগড় অ্যাসাইনমেন্টে। ঝাড়া তিন সপ্তাহ আমার বুকটা ছ'ইঞ্চি উঁচু হয়ে ছিল, গর্বে।'

'আর তুই? তুই ব্যাটা কম দেখিয়েছিস নাকি? টাইম-বোমাটা তো তুই-ই আবিষ্কার করেছিলি।'

কফি খেতে খেতে অনেক গল্প হলো। বেশির ভাগই পুরানো দিনের কথা। দুর্ঘটনায় এক হাত খোয়া যাওয়ায় হেড অফিস থেকে সরিয়ে ব্রাঞ্চ ইন-চার্জ করে দেয়া হয়েছে সোহেলকে। তাই সুযোগ পেলেই সে পুরানো দিনের গল্পে ফিরে গিয়ে স্মৃতি রোমন্থন-সুখ অনুভব করতে চায়। এক কালের ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর সাথে সে-সব গল্প করে রানাও আনন্দ পায়। কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে একটা সিগারেট বের করে ধরাল সোহেল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তুই কাজ কর, আমি জাহেদকে খানিকটা ডিসটার্ব করে আসছি।'

সোহেল বেরিয়ে যেতেই ফাইলের মধ্যে ডুবে গেল রানা।

রাত ঠিক পোনে আটটার সময় বেজে উঠল সিনক্রোফোন রানার পকেটে। রানা তখন গাড়িতে। এলিফ্যান্ট রোডের জামান ড্রাগ হাউজের সামনে থামাল সে তার লরেল গ্রীন মেটালিক কালারের নতুন টয়োটা করোনা সিডান। চেনা ডাক্তার। রিসিভার তুলে নিল রানা।

সিনক্রাফোন্ হচ্ছে ম্যাচ বাক্সের মত দেখতে প্লাস্টিকের ছোট একটা রেডিও রিসিভার। এজেন্টদের বিশেষ কাজে দিনে-রাতে যে কোনও সময় ডাকতে হতে পারে। সেজন্যে নতুন এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেছেন রাহাত খান অল্পদিন হলো। হেড অফিসের দশ মাইলের মধ্যে থাকলে এর সাহায্যে যে কোন এজেন্টকে ডাকা যায়। পিপ্ পিপ্ করে শব্দ হয় এতে। এই শব্দ শোনা মাত্র যাকে ডাকা হচ্ছে তার কাজ হলো যেখানে যে অবস্থায় থাকুক নিকটস্থ টেলিফোনে অফিসের সঙ্গে

যোগাযোগ করা।

৮০০৮৩ ঘোরাতেই প্রথমে মিস্ নেলী, তারপর গোলাম সারওয়ার হয়ে রাহাত খানের কাছে পৌঁছল রানার উৎসুক কণ্ঠস্বর।

'আমি বাসায় আছি। আজ রাতে আমার সাথে খাবে তুমি। আধ ঘণ্টার মধ্যে চলে এসো। সোহেলকেও ডেকেছি।'

কথাটা বলে উত্তরের অপেক্ষা না করেই ফোনটা নামিয়ে রেখে দিলেন রাহাত খান। রানা ভেবেছিল আজ আর ডাক পড়বে না। তাই অফিসের পর দু'একটা কাজ সেরে ক্লাবে স্কোয়াশ খেলতে যাচ্ছিল। এলিফ্যান্ট রোড থেকে সোজা বাড়ি ফিরে এল সে। কাপড়-জামা পাল্টে রওনা হয়ে গেল ধানমণ্ডির দিকে।

ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকায় ঠিক লেকের পারে চমৎকার একখানা একতলা বাড়ি। সাদা উর্দি পরা বেয়ারা রানাকে নিয়ে বসাল ড্রইংরুমে।

'আমি এক্ষুণি সাহেবকে খবর দিচ্ছি। আপনি এক মিনিট বসুন, স্যার।'

প্রকাণ্ড একটা কালো হাউণ্ড ঢুকল ঘরে। রাহাত খানের শখের কুকুর। পিছন পিছন চেইন হাতে ঢুকলেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। চেনা লোক, তাও ওকে উঠে দাঁড়াতে দেখে একবার কটমট করে চাইল কুকুরটা রানার দিকে। আপাদমস্তক সবুজ দৃষ্টি বুলাল সে। কোনও আগন্তুককেই পছন্দ করে না হাউণ্ডটা—'কার মনে কি আছে বলা যায় কিছু? মানুষ তো!' কাজেই ওর চোখে স্পষ্ট শাসন—'কোনও রকম চালাকির চেষ্টা কোরো না, বাছা, বিপদে পড়বে।'

'বসো, রানা। সোহেল আসেনি? এখুনি এসে পড়বে। ডিনারও রেডি। খেতে খেতেই কাজের কথা সেরে নেয়া যাবে।'

'আপনার দেহরক্ষীটাকে সামলান, স্যার। যেমন কটমট করে চাইছে আমার দিকে, মনে হচ্ছে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে।'

একটু হেসে মাথায় দুটো থাবড়া দিয়ে আদর করলেন রাহাত খান ভয়াল কুকুরটাকে। তারপর বললেন, 'যাও, অনেক দৌড়াদৌড়ি হয়েছে, তোমারও ডিনার রেডি। খাও গিয়ে।' শিকলটা বেয়ারার হাতে দিয়ে রানাকে বললেন, 'একটু ব্যায়াম করাচ্ছিলাম ওকে। যুদ্ধের পর থেকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে বেচারার প্রতি অবিচার হয়ে যাচ্ছে। একেবারেই সঙ্গ পায় না আমার।'

হাফপ্যান্ট আর টাওয়েলের গেঞ্জি পরনে, পায়ে কেড্স্। এই বেশে আর ড্রইংরুমে বসলেন না রাহাত খান। রানাকে বসিয়ে কাপড় ছাড়তে গেলেন। টেবিলের উপর থেকে ডেভিড ওয়াইজ আর টমাস বি. রসের 'দ্য ইনভিজিবল্ গভর্নমেন্ট' তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাতে থাকল রানা। পেপার ব্যাক এডিশন। বইটার প্রতি পৃষ্ঠায় 'সি. আই. এ.' শব্দটা পাওয়া গেল গড়ে দশটা করে। কয়েক পৃষ্ঠা পড়া হতেই দু'দিকের দুই দরজা দিয়ে একসাথে ঘরে প্রবেশ করল সোহেল এবং রাহাত খান।

'এই যে, সোহেলও এসে গেছ। চলো, একেবারে খাবার টেবিলে গিয়েই বসি।'

সুপ শেষ হতেই বাটিগুলো তুলে নিয়ে গেল বেয়ারা। মুখ খুললেন রাহাত খান।

'স্মাগ্লিং যে এত সিরিয়াস একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে, ভাবিনি কোনদিন। ব্যাপারটা চিরকাল হয়ে এসেছে, বর্তমানে হচ্ছে, ভবিষ্যতেও হবে।

আমাদের আসল সমস্যা এখন স্মাগলিং নয়—এর পিছনের প্রতিভাবান ব্যক্তিটিকে ধ্বংস করা। তোমরা দু'জনেই তো ফাইলটা পড়েছ। কারও কোন প্রশ্ন আছে?'

'দেখলাম, শুধু গত বছরেই আনুমানিক দু'শো কোটি টাকার সোনা এসে পৌঁচেছে এখানে। এটা যখন অনুমান করা সম্ভব হয়েছে, কিভাবে কোন পথে এই চোরা-চালান আসছে সেটা আন্দাজ করা যায়নি?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'তাছাড়া সিআইডি এটাকে সিরিয়াসলি টেক-আপ করছে না কেন?' সোহেল বলে উঠল। 'কাউকে খুঁজে বের করবার কাজে ওরা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ।'

একটা মুরগির রানে কামড় বসিয়েছিলেন রাহাত খান। ওটাকে বাগে আনবার আগেই রানাকে আরেকটা প্রশ্ন করতে উদ্যত দেখে হাত তুলে থামার ইঙ্গিত করলেন। এক এক করে প্রশ্নের উত্তর দিলেন তিনি।

'না। অভিনব কোনও পদ্ধতিতে সোনা চালান হচ্ছে, এটুকু টের পাওয়া গেলেও পদ্ধতিটা জানা যায়নি। পথ হচ্ছে: জল, স্থল বা আকাশ; অথবা তিনটেই। আর এর মূল উৎস হচ্ছে মিডল-ঈস্ট। সিআইডি-র জুরিসডিকশনের বাইরে। আমরা যখন এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে রাজি হলাম তখন সবটা দায়িত্ব আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে ওরা হাত গুটিয়ে নিয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। আমাদের মত ওরাও কয়েকজন যোগ্য লোক হারিয়েছে। কাজেই বিপক্ষকে আণ্ডার-এস্টিমেট করবার ধৃষ্টতা আমাদের থাকা উচিত নয়। তুমি ঠিকই ধরেছ, রানা। যদি ওদের সোনা পাচার করবার পদ্ধতি আমাদের জানা থাকত তাহলে ব্যাক ক্যালকুলেশন করে আজ হোক কাল হোক মূল উৎসে পৌঁছানো অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সোনা একটা অদ্ভুত জিনিস। এর কোনও নির্দিষ্ট আকার নেই। গলিয়ে ফেললেই এর গায়ের সব চিহ্ন মুছে ফেলা যায়, অথচ দাম কমে না এক পয়সাও। তারপর যে কোনও ছাঁচে ফেলে যে কোনও আকার দেয়া যায় সেটাকে। কাজেই ধরা খুব মুশকিল।'

এতক্ষণ কথা বলায় যেটুকু সময় নষ্ট হয়েছিল তা পূরণ করে নিলেন রাহাত খান কিছুক্ষণ চুপচাপ একমনে আহার ক'রে। ওঁর বক্তব্য শেষ হয়নি তাই এই সুযোগে নতুন কোনও প্রশ্ন করল না কেউ।

'এমন কি, ইচ্ছে করলে এক রকম খয়েরি রঙের পাউডারেও পরিণত করা যায় সোনাকে। হাইড্রোক্লোরিক এবং নাইট্রিক অ্যাসিডের মিশ্রণের মধ্যে ফেললেই গলে তরল হয়ে যায় সোনা। তারপর সালফার ডাইয়োক্সাইড বা অক্জালিক অ্যাসিড দিলে খয়েরি পাউডার হয়ে যাবে সেটা। ইচ্ছে করলেই হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উত্তাপ দিয়ে আবার সেটাকে সোনার টুকরো বানিয়ে নেয়া যায়। ক্লোরিন গ্যাসটা একটু খেয়াল রাখতে হয়, তাছাড়া পদ্ধতিটা খুবই সহজ। কাজেই দেখা যাচ্ছে, কঠিন বা তরল, এমন কি পাউডার হয়েও আসতে পারে এ জিনিসটা জল, স্থল কিংবা আকাশ পথে। আমরা এখানে এই সবগুলোর ওপরই তীক্ষ্ণ নজর রাখছি, কোনও রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারলে তোমাদের জানানো হবে।'

'আমাদের দু'জনকে আলাদা ভাবে পাঠাচ্ছেন কেন?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'তোমাদের যে-কোনও একজনকে ওরা চিনে ফেললে অপরজন অতর্কিতে সাহায্য করতে পারবে, এই ভরসায়। দু'জন সম্পূর্ণ আলাদা শ্রেণীর লোক সেজে

যাচ্ছ। দু'জনকে একসাথে সন্দেহ করতে পারবে না ওরা। যদি করে, তাহলে তোমাদের কপাল খারাপ বলতে হবে।'

খাওয়া হয়ে গেলে ড্রইংরূমে গিয়ে বসল তিনজন। বিস্তারিত আলোচনা হলো কেসটা নিয়ে। সোহেল যাচ্ছে হিংলাজ দর্শনপ্রার্থী বাঙালী সাধু হয়ে, আর রানা যাবে করাচিতে এ-অঞ্চলের কিছু মালের হোল্-সেল্ মার্কেট তৈরি করতে। যখন নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিত হবে তখন কিভাবে কোন্ পথে এগোবে তা নিয়েও বিশদ আলাপ হলো।

সিগারেটের পিপাসা লেগেছিল সোহেলের অসম্ভব রকমের। বুকের ভিতরটা খালি হয়ে এসেছিল ধুঁয়োর অভাবে। ওর অবস্থা অনুমান করে বেশিক্ষণ আর আটকে রাখেননি ওদের রাহাত খান।

চারদিন পর সন্ধ্যার ফ্লাইটে রওনা হলো রানা করাচির উদ্দেশে।

দুই

লাস্যময়ী মেয়েটা। নাম জিনাত সুলতানা। লম্বা একহারা দেহে আঁটসাঁট করে পেঁচিয়ে পরা নাইলন শাড়িতে চমৎকার মানিয়েছে। কলগার্ল নাকি?

বোধহয় না। রানা ভাবছিল, তাই যদি হবে তাহলে কোনও পুরুষকে কাছে ভিড়তে দিচ্ছে না কেন মেয়েটা? সারা অঙ্গে যেন রূপের আগুন জ্বালিয়ে নিয়েছে সে। স্পর্শ করলেই হাত পুড়ে যাবে। অনেকের মত রানাও আলাপ করার চেষ্টা করে দেখেছে, ফিরে আসতে হয়েছে। এই আগুন যদি কেবল আত্মরক্ষার জন্যে ব্যবহৃত হত তাহলে এত আকর্ষণ বোধ করত না রানা। এত চিন্তাও করত না মেয়েটির জন্যে। কিন্তু পরিষ্কার বুঝতে পারছে সে, এই আগুনেই জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে মেয়েটি। নিজেকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করছে সে প্রতি পলে। বোধহয় সবটা তার দেখা হয়ে গেছে, লোভীর মত জীবনের সব রস পান করে ফেলেছে সে অল্প সময়ের মধ্যেই।

সাগরের নোনা হাওয়া থেকে সামনের মাজা-ঘষা চকমকে চেহারাটা আড়াল করবার জন্যে রাস্তার দিকে মুখ করে আর সাগরের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড সাততলা বীচ লাগজারি হোটেল। আধুনিক সব রকমের ব্যবস্থাই আছে। হোটেলের সামনে রাস্তার উপর দামী গাড়িগুলো তেরছা ক'রে সার বেঁধে দাঁড়ানো। অল্প দূরেই একটা ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে সব সময় অন্তত চারটে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে। লোহার গেট দিয়ে ঢুকেই সরু রাস্তার দু'পাশে নানান রকম ফুলের চমৎকার বাগান আর সবুজ ঘাস। কয়েক কদম এগোলেই লাউঞ্জে উঠবার সিঁড়ি। বাম পাশে রিসেপশন্ কাউন্টার। লাউঞ্জের এখানে-ওখানে সোফা সেট, সাইড টেবিল। ডান ধারে লিফ্ট্। পাশেই সিঁড়ি। প্রকাণ্ড লাউঞ্জ ছাড়িয়ে ঢুকতে হয় বেগুনি পর্দায় ঢাকা নানান রকম কারুকার্য খচিত বার ও রেস্তোরাঁয়। দুই পাশে দুই টবে লাগানো 'মানিপ্ল্যান্ট' লতিয়ে উঠেছে দেয়ালে। গোটা কতক অর্কিড ছাত থেকে সরু পিতলের চেইন দিয়ে ঝোলানো নক্সা আঁকা মাটির পাত্রে রাখা। নীলচে ফ্লোরেসেন্ট টিউবের

আলো আসছে সিলিং-এর চারটে গোল গর্ত থেকে। দুই পাশে দেয়ালে চুঘতাইয়ের মস্ত দুটো অয়েল পেইন্টিং। মোগলাই দরবারের সুরা পানের দৃশ্য। রেস্তোরাঁয় ঢুকলেই সামনে দেখা যায় সাগরের নীলিমা। প্রকাণ্ড একটা পুরু বেলজিয়ান কাঁচ বসানো আছে ওদিকটায় দেয়ালের বদলে। ইচ্ছে করলেই কালো স্ক্রীন দিয়ে ঢেকে দেয়া যায় রৌদ্রের প্রখরতা।

রেস্তোরাঁর পিছন দিকে সাগরের দিকে মুখ করে চুপচাপ একা বসে আছে রানা। আরেক কাপ কফি এনে রাখল বেয়ারা ওর টেবিলে।

কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা গেল আজও নির্দিষ্ট টেবিলে মুখোমুখি বসে জুয়া খেলছে মেয়েটি সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটির সাথে। আরও ঘন্টাখানেক খেলবে। সন্ধে হয়ে গেলেই উঠে পড়বে ওরা। লোকটি কোনও দিকে না চেয়ে সোজা চলে যাবে হোটেলের দোতলায় ওর কামরায়। মেয়েটি এসে ঢুকবে বারে। গ্লাসের পর গ্লাস মদ খাবে। পরিপূর্ণ মাতাল অবস্থায় টলতে টলতে চলে যাবে পাঁচ তলায় নিজের কামরায়।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে ঝিলমিল করছে আরব সাগর। হোটেলের পিছনে একটা সরু পীচ ঢালা রাস্তা সোজা চলে গেছে সমুদ্র তীরে। সেই রাস্তার ডান পাশে হোটেল থেকে গজ বিশেক দূরে সেইলরস ক্লাব। একতলা। পারটেক্সের ছাদ আর কাঁচের দেয়াল। সাগর থেকে আসা উদ্দাম হাওয়া রোধ করবার জন্যে প্রচুর টাকা ব্যয় করে লোহার ফ্রেমে আঁটা কাঁচের দেয়াল দেয়া হয়েছে চারপাশে। ফলে সাগর দেখা যায় পরিষ্কার, কিন্তু বাতাসের ধাক্কায় কফির কাপ বা টেবিলে বাঁটা তাস উল্টে যাবার ভয় নেই। নানান রকম জুয়োর ব্যবস্থা আছে ক্লাবটায়। সন্ধে হলেই কালো স্ক্রীন টেনে বাইরের জগৎ থেকে আলাদা করে দেয়া হয় ভিতরের জুয়াড়ীদের। তারপর সেখানে চলে সব চাইতে উঁচু স্টেকে টাকাওয়ালাদের ভাগ্যের উত্থান-পতন। সেইসাথে আরও কত কি! একজন 'সেইলর'ও পাত্তা পায় না সেখানে।

দিনের বেলায় স্ক্রীন সরিয়ে ফেলার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ভিতরের সবুজ ঘাসের গালিচা আর ফুলের কেয়ারিতে সূর্যের আলো এবং উত্তাপ লাগানো। তাছাড়া দিনের বেলা তেমন কোনও লোকজনও হয় না। মেয়েমানুষ তো প্রায় থাকেই না যে তাদের চক্ষু-লজ্জা থেকেই নিষ্কৃতি দিতে হবে। এই নিরিবিলি ক্লাবে কোণের টেবিলে মুখোমুখি বসে ফ্ল্যাশ খেলছে জিনাত সুলতানা সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সাথে। গত পাঁচদিন ধরে রোজ খেলছে।

দ্বিতীয় কাপ কফি সামনে নিয়ে চেয়ে রইল রানা ওদের দিকে। মনে হচ্ছে একটা প্রকাণ্ড অ্যাকুয়ারিয়ামের মধ্যে বসে আছে ওরা। হরেক রকমের মাছ আছে এতে। নালচে চুলের ওই প্রৌঢ় জুয়াড়ীকে রানার মনে হচ্ছে যেন গোল্ড ফিশ্। মেয়েটি অ্যাঞ্জেল ফিশ্। আর সে নিজে? একটু হেসে ভাবল, ঝগড়াটে আর হিংসুক সিয়ামিজ ফাইটার।

গত রাতে এতগুলো লোকের মধ্যে হঠাৎ যখন মেয়েটি মাত্রাতিরিক্ত সেবনের ফলে হিক্কা তুলে বমি করতে আরম্ভ করেছিল, ভদ্রলোকেরা ছিটকে সরে গিয়েছিল জামা কাপড় বাঁচাতে, তখন ছুটে গিয়ে ধরেছিল মাসুদ রানা। বেসিনে নিয়ে গিয়ে নিজ হাতে মুখ ধুইয়ে দিয়েছিল, চোখে মুখে পানি ছিটিয়ে নিজের রুমাল দিয়ে মুছে

দিয়েছিল ওর মুখ। তারপর? একটু সামলে নিয়েই ঠাস করে চড় বসিয়ে দিয়েছিল মেয়েটি রানার গালে। চিৎকার করে বলেছিল, 'নিজের চরকায় তেল দাও গিয়ে, বদমাশ কাহিকে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গিয়েছিল সোজা নিজের ঘরে। ঘর ভর্তি মহিলারা আন্তরিক দুঃখিত এবং পুরুষেরা আনন্দিত হয়েছিল এই ঘটনায়। অপমানিত রানাকেও 'রেস্তোরাঁ' ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল মাথা নিচু করে।

কিন্তু আজ রানার দিকে চেয়ে মুচকে হাসল কেন মেয়েটি? কী অপূর্ব সেই হাসি!

কে এই মেয়েটি? রিসেপশনিস্টের কাছ থেকে কেবল নামটা জানা গেছে। আর সব কিছুই রহস্যময়। পাঁচ দিন আগে হঠাৎ এসে উঠেছে এই হোটেলে। রানা স্থির করল মেয়েটি সম্পর্কে সব তথ্য বের করতেই হবে। আগামী কালকেই। অদ্ভুত এক অমোঘ আকর্ষণে টানছে মেয়েটি ওকে।

রানা ভাবছে, সোনার চোরাচালান ধরতে পারছে না কাস্টমস্, কিন্তু কেউ যদি এই মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের দেশে যায়, তাহলে ঠিক ধরে ফেলবে। এই মেয়েটি খাঁটি সোনা। অনেক কষ্টি পাথরে যাচাই করা। কারও চোখ এড়ানো সম্ভব নয়, ঠিক আটকে ফেলবে কাস্টমস্। কথাটা মনে উদয় হতে একটু হাসল রানা।

এক চুমুকে অবশিষ্ট কফিটুকু গলাধঃকরণ করে রানা ভাবল সাগর তীরে হাঁটবে খানিকক্ষণ। আরও খানিকটা নেমে এসেছে সূর্য পশ্চিম দিগন্তে। আর কিছুক্ষণ পরেই মেঘেরা পরবে রঙীন সাজ। তারপর বসন্তের রাত্রি নামবে করাচি বন্দরে। মহানগরীর অলিতে গলিতে নেমে আসবে পাপ-পঙ্কিল বিভীষিকা। গলিমুখে রূপজীবিনী, হোটেলে বারে জুয়া-মদ ইত্যাদির ছড়াছড়ি। ভদ্রতার খোলস ছেড়ে মানুষের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসবে পশু। বসন্তবাহার মাতাল করে তুলবে বাঈজীর সঙ্গীত কক্ষের মদ্যপ শ্রোতাদেরকে।

উঠে পড়তে যাচ্ছিল রানা, এমন সময় চোখে পড়ল ঠিক দশ হাত দূরে জিনাত সুলতানা! সারা দেহে হিল্লোল তুলে এগিয়ে আসছে ওর টেবিলের দিকে। বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকল রানা ওর দিকে। গত রাতের দুর্ব্যবহারের জন্যে ক্ষমা চাইবে নাকি মেয়েটা? সন্ধের আগেই আজ খেলা ছেড়ে উঠে এল যে? রানার চোখে চোখ পড়তেই বিচিত্র এক টুকরো হাসি খেলে গেল মেয়েটির ঠোঁটের কোণে।

'বসতে পারি?' ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

'নিশ্চয়ই।'

ঠিক রানার পাশের চেয়ারে বসে পড়ল জিনাত। সেন্টের গন্ধ এল নাকে। মেয়েটিকে দেখলেই প্রখর রোদ আর সোডা ওয়াটারের ঝাঁঝের কথা মনে পড়ে যায়। কড়া সেন্টের গন্ধ বেমানান লাগে না একে মাখলে। আঙুলের ফাঁকে জ্বলছে একটা সিগারেট।

'আমার পেছনে লেগেছ কেন তুমি? গত তিনদিন ধরেই দেখছি। কি চাও তুমি আমার কাছে?' আচমকা প্রশ্ন করল মেয়েটি।

কোন উত্তর না দিয়ে মৃদু হাসল রানা। হাওয়া তাহলে এই দিকে বইছে। টেবিলের উপর দুই কনুই রেখে হাতের তালুর উপর চিবুক রেখেছে জিনাত। চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে রানার চোখের উপর।

'কি? উত্তর দিচ্ছ না যে? কেন আমার পেছনে লেগেছ তুমি?'

'ভাল লেগেছে, তাই।'

জীবনে কতবার যে কথাটা বলেছে রানা। ভাবল, এবারও বুঝি কাজে লাগবে এ স্তুতি। কিন্তু না, ভুরু জোড়া কুঁচকে গিয়েই আবার সোজা হয়ে গেল জিনাতের। একটুও হাসল না সে। কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ লাগল রানার কাছে।

'ভালবাসো আমাকে?'

হঠাৎ প্রশ্ন করে বসল জিনাত। অবাক হয়ে গেল রানা। পাগল নাকি? এ কেমন ধারা প্রশ্ন? চেনা নেই, শোনা নেই, কিচ্ছু না; হঠাৎ 'ভালবাসো'?

'সে সুযোগ কি পেয়েছি?' বলল সে স্বাভাবিক কণ্ঠে।

'পছন্দ করো?'

'নিশ্চয়ই। তোমাকে কে না পছন্দ করবে, বলো?'

হঠাৎ অ্যাশট্রের মধ্যে সিগারেটটা ঠেসে মুচড়ে নিভিয়ে দিল জিনাত। মনে হলো কোনও একটা ভয়ঙ্কর আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ হলো এইভাবে। চিবুক থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে আবার সোজা রানার চোখের উপর চোখ রাখল সে।

'ঠিক। সবাই পছন্দ করে। তার কারণও আমার অজানা নেই।' বিদ্রূপের বাঁকা হাসি ফুটে উঠল ওর অধরে। তারপর আবার বলল, 'সবাই পছন্দ করে। খুব সহজেই পাওয়া যায় আমার বন্ধুত্ব। চাও তুমি?'

ধক্ করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। হঠাৎ কি হলো মেয়েটির? এসব কি বলছে সে?

'একটু অসুবিধায় পড়েছি। কিছু টাকা ধার দিতে পারবে আমাকে? আজই রাতে ফেরত দেব, সুদে-আসলে।'

আশ্চর্য হয়ে গেল রানা। কিন্তু সে-ভাব প্রকাশ করল না। বুঝতে পারছে, কিছু একটা গোলমাল আছে মেয়েটার মধ্যে। কোথায় যেন হিসেব ঠিক মেলে না।

'টাকার তো তোমার অভাব আছে বলে মনে হয় না,' বলল রানা। 'কিন্তু সে কথা থাক, কত টাকা চাই?'

'দশ হাজার। এখুনি আমার দরকার।'

'কি করবে টাকা দিয়ে?'

'সেটা তোমাকে বলতে আমি বাধ্য নই। তবু বলছি। ফ্ল্যাশ খেলব।'

'এই পাঁচ দিন খুব ফ্ল্যাশ খেলছ বোধহয়, ওই লোকটার সাথে?'

'হ্যাঁ।'

'কত টাকা হারলে?'

'দেড় লাখ।'

'দে-ড় লা-খ টাকা! অথচ এখনও নেশা কাটেনি তোমার?'

'এত কথা শুনতে চাই না। টাকা দেবে কিনা বলে দাও পরিষ্কার।'

'ওই জোচ্চোরের সাথে ফ্ল্যাশ খেলে হারবার জন্যে তোমাকে এক পয়সাও দিতে পারব না আমি। কেন তুমি এড়াবে…'

'উপদেশ খয়রাত করবার কোনও প্রয়োজন নেই, মি. মাসুদ রানা। ভাল-মন্দ বুঝবার বয়েস আমার হয়েছে। মনে কোরো না তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে

এসেছি আমি। তুমি ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই, ভুলেও এ ধারণা কোরো না। এটা তোমার প্রতি একটা বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। ওয়ালী আহমেদ প্রস্তাব দিয়েছে, শুধু একটু অনুগ্রহ করলেই আমার সব টাকা সে ফিরিয়ে দেবে। আমি রাজি হইনি। ওর কাছ থেকে যদি না-ও নিই, এখানকার যে কোনও লোকের কাছে চাইলে পাব। কাজেই উপদেশ দিতে এসো না। তোমাকেই প্রথম সুযোগ দেব মনে করেছিলাম। যাক, তুমি যখন রাজি নও তখন, সো লঙ।'

উঠে পড়ছিল জিনাত, রানা ধরে ফেলল ওর হাত। বসে পড়ল সে আবার।

'তোমাকে যত দেখছি ততই তোমার জন্যে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছি আমি, জিনাত। আমিই দিচ্ছি টাকাটা। ফেরত দিতে হবে না। তোমাকে আমি···'

'মহত্ব দেখানো হচ্ছে, না?' খেপে উঠল জিনাত। 'তোমার দয়া চাই না আমি। যদি দাও, ওই টেবিলে পৌঁছে দেবে টাকাটা।' উঠে দাঁড়াল সে। ঘড়িটা দেখল একবার। 'মনে রেখো, পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করব আমি তোমার জন্যে।'

চলে গেল জিনাত সেইলরস ক্লাবের দিকে। রানা চেয়ে দেখল নিবিষ্ট চিত্তে খবরের কাগজ পড়ছে ওয়ালী আহমেদ। গত রাতে ডলফিন ক্লাবে বাকারাত খেলে চল্লিশ হাজার টাকা জিতেছে রানা। তার থেকে দশ হাজার খরচ করা ওর পক্ষে কিছুই না। স্থির করল, টাকাটা দেবে। মেয়েটির নিশ্চয়ই মাথার গোলমাল আছে। তীব্র কোনও বেদনা লুকিয়ে আছে ওর মনের মধ্যে, অহরহ ছিন্নভিন্ন করছে। ওর প্রতি অদ্ভুত একটা মমত্ববোধ জাগল রানার মনে। টাকা না দিলে মেয়েটি যাচ্ছে-তাই করে বসতে পারে, সেজন্যে দেবে।

লিফটে করে সোজা পাঁচতলায় উঠে ঘর থেকে টাকাগুলো নিল রানা। ঘরের সঙ্গে লাগানো ছোট্ট ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। হু-হু হাওয়া আসছে সাগর থেকে। ঢেউ ভেঙে পড়ছে এসে বালুকা বেলায়। ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা। একটা ফান্টার বোতল হাতে দাঁড়িয়ে আছে জিনাত ক্লাবের দরজার সামনে। রানার উপর চোখ পড়ল জিনাতের। রানা হাত নাড়ল। ক্লাবের ভিতর ঢুকে গেল জিনাত। একতলার লাউঞ্জ দিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় রানা লক্ষ করল সেই তিনজন লোক ঠিকই বসে আছে কোণের টেবিলে। রানার দিকে নির্বিকার মুখে তাকাল একজন। পাশের লোকটিকে কিছু বলল। সে-ও চাইল রানার দিকে। মতলব কি ব্যাটাদের? এরা নজর রাখছে কেন তার ওপর? ধরা পড়ে গেল নাকি সে? সাবধান হতে হবে। গত তিন দিন থেকে এখানে আড্ডা গেড়েছে লোকগুলো। বেরিয়ে গেল রানা লাউঞ্জ থেকে চিন্তিত মুখে।

কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা, তবু খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলল না ওয়ালী আহমেদ। পরিচয় করিয়ে দেবে বলে জিনাত ডাকল, 'এই যে, শুনছেন?' তাও কোনও সাড়া নেই। গলা নিচু করে জিনাত রানাকে বলল, 'কানে কম শোনে।' তারপর জোরে আবার ডাক দিল, 'কই, সাহেব, শুনছেন?'

'অ্যাঁ!' বলে চমকে উঠল ওয়ালী আহমেদ। কাগজটা চোখ থেকে নামিয়ে রানাকে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

'ইনি মিস্টার ওয়ালী আহমেদ, আর ইনি মিস্টার মাসুদ রানা,' বলল জিনাত।

'গ্ল্যাড টু মিট ইউ, মিস্টার মাসুক নানা।' উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাণ্ড শেক করল ওয়ালী

আহমেদ। নরম তুলতুলে হাতটা। যেন কাদা দিয়ে তৈরি, কিংবা বাতাস ভরা গ্লাভ। গা-টা ঘিন্ ঘিন্ করে উঠল রানার। লম্বা চওড়া মেদবহুল দেহ লোকটার। চুলগুলো লালচে। বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে। ঠোঁটের ওপর পাতলা লালচে গোঁফ। সারাটা মুখে বুটি বুটি বসন্তের দাগ। অস্বাভাবিক সবুজ চোখ। একটু খেয়াল করতেই রানা বুঝল চশমার বদলে কন্ট্যাক্ট লেন্স লাগিয়ে নিয়েছে চোখে। স্থির দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে চেয়ে থাকল ওয়ালী আহমেদ কয়েক মুহূর্ত। তারপর অমায়িক হাসি হেসে বলল, 'বসুন, মিস্টার নানা।'

হাসির সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল দাঁতগুলো। ঠিক যেন তরমুজের বিচি। এতক্ষণে রানার চোখে পড়ল টেবিলের একপাশে রাখা একটা রূপোর কৌটা। পান ভর্তি। পাঁচ মিনিট অন্তর অন্তর একটা করে পান মুখে দিচ্ছে সে। ফলে দাঁতগুলো আর দর্শনযোগ্য নেই।

'আমার নাম মাসুদ রানা। মাশুক নানা নয়,' একটা চেয়ারে বসে বলল রানা।

'ও আচ্ছা, আচ্ছা। মাসুদ নানা। মাসুদ নানা।' মুখস্থ করবার মত করে বলল ওয়ালী আহমেদ। তারপর বুক পকেট থেকে হিয়ারিং এইড্টা বের করে কানে লাগাল। মৃদু হেসে বলল, 'আপনিও খেলবেন নাকি, মিস্টার নানা?'

'জী, না।'

টাকা ভর্তি এনভেলপটা জিনাতের হাতে দিল রানা ওয়ালী আহমেদকে আড়াল করে। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করল না ওয়ালী আহমেদ। জিনাতকে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে? খেলা কি আজকের মত শেষ?'

'শেষ হবে কেন, ডিল করুন না। টাকা জোগাড় হয়ে গেছে।'

রানার দিকে আরেকবার চাইল ওয়ালী আহমেদ চট্ করে। তারপর একটা পান মুখে ফেলে নতুন এক প্যাকেট তাস সর্ট করতে আরম্ভ করল। রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'আছেন কোথায়, মি. নানা?'

'এই হোটেলেই।' আঙুল দিয়ে দেখাল রানা হোটেলের দিকে।

'না, মানে, কি করছেন?'

'ব্যবসা।'

'কিসের ব্যবসা?' কার্ড ডিল করে জিজ্ঞেস করল আবার ওয়ালী আহমেদ।

'ঢাকার কয়েকটা প্রোডাক্টের জন্যে করাচিতে হোলসেল মার্কেট তৈরির চেষ্টায় এসেছি আমি।'

'কেমন রেসপন্স পাচ্ছেন?' একশো টাকার নোট খেলল ওয়ালী আহমেদ।

'মন্দ না।'

দুই এক দান খেলেই শো করতে বলল জিনাত। জ্যাক টপেই দান জিতে নিয়ে গেল ওয়ালী আহমেদ।

'তা ক'দিন থাকবেন?'

'আর সপ্তাহ খানেক।'

রানার ইচ্ছে, আরও কয়েক দান খেলা দেখবে। রহস্যটা ভেদ করতেই হবে। বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে চুরি করছে ওয়ালী আহমেদ। কিন্তু ভাবছে, এতবড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট—যে একটা ব্যাঙ্কের ম্যানিজিং ডিরেক্টর, যে একটা মোটর

অ্যাসেম্বলিং প্ল্যান্ট, তিনটে কটন মিল, একটা জুট মিল এবং গোটাকয়েক নামজাদা হোটেলের মালিক, এবং আরও বহু কোম্পানির ডিরেক্টর, সেই ওয়ালী আহমেদ একটা সাধারণ সোসাইটি গার্লের কাছ থেকে সামান্য কিছু টাকা জোচ্চুরি করে ছিনিয়ে নিতে যাবে কেন? অথচ চুরি যে করছে তাতে কোনও ভুল নেই। নইলে দুই হাতের ফ্ল্যাশ খেলায় পাঁচ দিনে দেড় লক্ষ টাকা জেতা এক কথায় অসম্ভব। যত উঁচু স্টেকই হোক না কেন।

আবার পঞ্চাশ টাকা বোর্ড-ফী রাখল দু'জন। তিনটে-তিনটে ছ'টা কার্ড বেঁটে দিল জিনাত ওয়ালী আহমেদের কাটা হয়ে গেলে পর। এবারেও হারল জিন্যাত। রানা লক্ষ করল কার্ড বাঁটার মধ্যে কোনও রকম চাতুরীর আভাস নেই। আঙুলে আংটি কিংবা সার্জিক্যাল টেপ নেই যে চিহ্ন দিয়ে রাখবে তাসে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খেলা ওয়ালী আহমেদের। অথচ ছ'মিনিটের মধ্যেই দুই হাজার টাকা হেরে গেল জিনাত। জিনাতের হাতে ভাল কার্ড পড়লেই কিভাবে যেন টের পেয়ে যাচ্ছে ওয়ালী আহমেদ। ফেলে দিচ্ছে হাতের তাস। শুধু বোর্ড ফী-টা পাচ্ছে জিনাত। কিন্তু নিজের হাতে যদি বেশি ভাল কার্ড থাকে তাহলে অনেকদূর পর্যন্ত এগোচ্ছে খেলা—জিনাত 'শো' না দিলে খেলেই চলেছে। কোনও রকম ব্লাফেই বিচলিত করতে পারছে না জিনাত ওকে। রানা স্থির নিশ্চিত হলো, চুরি করছে ওয়ালী আহমেদ। কিন্তু কি উপায়ে?

একবার জিনাত পেল ফ্ল্যাশ। ফেলে দিল ওয়ালী আহমেদ ওর হাতের কার্ড 'অন্ধ' বলে। চট করে কার্ডগুলো তুলে রানা দেখল কিং-এর পেয়ার ছিল ওর হাতে। কিন্তু এক দানও না খেলে হাতের কার্ড নামিয়ে রেখেছে ওয়ালী আহমেদ।

'অদ্ভুত আপনার আন্দাজ তো!' টিটকারি মারল রানা।

'জী; হাঁ। আমি মুখ দেখলেই বুঝতে পারি কার হাতে কি আছে। এই চোখে কিছুই এড়ায় না।' বলে একটা পাই পয়সা দিয়ে দুটো টোকা দিল দুই চোখে। ঠুন ঠুন করে শব্দ হলো কন্ট্যাক্ট লেন্সে লেগে।

'মিস জিনাত কি বরাবরই হারছেন আপনার কাছে?'

'বরাবর। ওঁকে নিষেধ করেছি। তবু উনি খেলবেন।'

'আমি দেখেছি জায়গা বদলালে অনেক সময় ভাগ্য ফিরে যায়। আপনারা জায়গা বদলে নিলেই পারেন,' বলল রানা।

'সেটা সম্ভব নয়,' গম্ভীর মুখে বলল ওয়ালী আহমেদ। 'সেটা আমি প্রথম দিনই মিস্ সুলতানাকে বলে নিয়েছি। ওদিকে বসলে সাগর চোখে পড়ে। অ্যাগোরাফোবিয়া রোগ আছে আমার। চোখের সামনে খোলা বিস্তৃতি সহ্য করতে পারি না। তাই হোটেলের দিকে মুখ করে বসি সব সময়। উল্টো দিকে বসলে খেলতে পারব না আমি।'

'ক্লসট্রোফোবিয়ার নাম শুনেছি, কিন্তু অ্যাগোরাফোবিয়া তো শুনিনি কোনদিন।'

'হ্যাঁ। বেশ অসাধারণ রোগ।'

মুখে পান ফেলল ওয়ালী আহমেদ। রানার অনেকখানি বোঝা হয়ে গেছে।

'আপনিও বোধহয় এই হোটেলেই আছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ।'

'ওই যে খোলা দেখা যাচ্ছে, ওটা আপনার সুইট না? দোতলাতেই আছেন বোধহয়?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।' স্থির দৃষ্টিতে রানার দিকে চেয়ে বলল ওয়ালী আহমেদ। 'অনেকগুলো দরজাই খোলা দেখা যাচ্ছে। ওগুলোর মধ্যে একটা আমার। আগামী তিন বছরের জন্য ভাড়া নিয়েছি ওটা আমি।'

উঠে জিনাতের পিছনে দাঁড়াল রানা কিছুক্ষণ। দেখা গেল জিততে আরম্ভ করেছে জিনাত। মৃদু হেসে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল রানা ক্লাব থেকে। হোটেলের দিকে যেতে যেতে পাশ ফিরে একবার দেখল রানা ওদের। ইতিমধ্যে সাত হাজার টাকা হেরে গিয়েছে জিনাত। ওয়ালী আহমেদ হোটেলের দিকে মুখ করে বসতে চায়, নাকি জিনাতকে হোটেলের দিকে পিঠ দিয়ে বসাতে চায়?

ওয়ালী আহমেদের সুইট-এর দিকে চাইল রানা। কিছু নেই। বিকেলের পড়ন্ত রোদ ব্যালকনিতে। খোলা দরজা দিয়ে ঘরটা অন্ধকার দেখাচ্ছে।

ফিরে গেল রানা রেস্তোরাঁয়। আবার চোখ পড়ল তার সেই তিনজন লোকের ওপর। কি চায় এরা? জোর করে দূর করে দিল মন থেকে এদের চিন্তা। আবার কফির অর্ডার দিয়ে আগের সেই চেয়ারটায় গিয়ে বসল সে আবার। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে জুয়াড়ীদের। বুঝতে পেরেছে রানা ওয়ালী আহমেদের অবিচ্ছিন্ন জয়ের রহস্যটা। কিন্তু ওকে ধরিয়ে দেয়ার আগ্রহ বোধ করল না সে মোটেই। কি হবে একজন ক্ষমতাশালী লোককে অকারণে ঘাঁটিয়ে? ওয়ালী আহমেদ চুরি করলে ওর কি? শত্রু বাড়িয়ে লাভ আছে?

কিন্তু অদ্ভুত বুদ্ধিমান তো এই হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বড়লোকটি! আশ্চর্য!

তিন

রাত অনেক। ইজি চেয়ারে শুয়ে পাতা ওল্টাচ্ছে রানা জন ব্লেকের 'দা গোল্ড স্মাগলিং' বইয়ের। স্বর্ণ-ইতিহাস থেকে আরম্ভ হয়েছে বইটা। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ মাটি খুঁড়ে চলেছে সোনার লোভে। কোথায় ঈজিপ্টের সোনা, মন্টেজুমা আর ইনকাসের খনি। মধ্যপ্রাচ্যের স্বর্ণখনি নিঃশেষ করল মিডাস আর ক্রোয়েসাস। ইউরোপে রাইন, পোর উপত্যকা, মালাগা, গ্রানাডার সমতলভূমি চষে ফেলা হলো। সোনা চাই, সোনা চাই, খেপে উঠল পৃথিবীর মানুষ। নিঃশেষ করল বালকান আর সাইপ্রাসের সোনা। ওদিকে রোমানরা সোনা তুলল ওয়েল্‌স, ডেভন আর কর্ণওয়াল থেকে। তারপর এল মেক্সিকো, পেরু। তারপর গোল্ড কোস্ট। উনবিংশ শতাব্দীতে লেনা এবং ইউরালে খনি আবিষ্কার করল রাশিয়ানরা। সে-ও শেষ। এখন সোনা উঠছে অরেঞ্জ ফ্রী স্টেটে।

কেবল ১৫০০ থেকে ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আঠারো হাজার টন সোনা তোলা হয়েছে পৃথিবীর বুক থেকে। ১৯০০ থেকে আজ পর্যন্ত (১৯৬৩ খ্রি: সংস্করণ) তোলা হয়েছে একচল্লিশ হাজার টন। আগামী পঞ্চাশ বছরেই শেষ হয়ে যাবে গোটা পৃথিবীর স্বর্ণ-সঞ্চয়।

বিরক্ত হয়ে বইটা রেখে দিল রানা। বইখানা গছিয়ে দিয়েছিলেন ঢাকায় রাহাত খান। বলেছিলেন চমৎকার বই, খুব মজার। বুড়ো যে কিসে মজা পায় আর কিসে পায় না বোঝা মুশকিল। বিশ পাতা পড়ে রানা বুঝল, এর মধ্যে দাঁত ফোটানোর ক্ষমতা ওর নেই। এ আখের রস, তালের নয়। মজা পেতে হলে দাঁতের জোর চাই।

ইংরেজদের ওই দোষ। যা করবে একেবারে গোড়া বেঁধে নিয়ে করবে। আরে বাবা, লিখতে বসেছিস গোল্ড স্মাগলিং। থ্রিলার সিরিজের মত লিখে যাবি চমকপ্রদ সব ঘটনা। অত লেকচার মারছিস কেন? এই থিসিস সাবমিট করে দিলেই তো পি.এইচ.ডি.মিলে যেত। তা না করে কেন মিছে আমাদের মত সাধারণ পাঠককে নাকানি-চুবানি খাওয়ানো, বাবা? অত যদি বিদ্যের ভুড়ভুড়ি ওঠে পেটের মধ্যে তো কলেজে ঢুকে পড়ো না, চাঁদ। প্রচুর শ্রোতা পাবে।

মেজাজটাই খারাপ করে দিয়েছে বইটা। টেবিল থেকে তুলে নিয়ে আবার সজোরে রাখল রানা ওটাকে টেবিলের উপর। গায়ের ঝাল একটু কমল। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল সে। সোঁ-সোঁ একটানা সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে। স্লীপিং গাউনটা পত্ পত্ উড়ছে পতাকার মত। নিচে সেইলরস ক্লাবের কাঁচের ওপাশে কালো পর্দা টানা। এক-আধ চিলতে উজ্জ্বল আলো এসে পড়ছে বাইরে। কালো আলখেল্লা গায়ে জাদুকরের মত লাগছে ঘরটাকে। ভিতরে তার অসীম রহস্য। আর দুষ্টবুদ্ধির ঝিলিক।

এই আলখেল্লার জন্যেই ওয়ালী আহমেদ সন্ধ্যার পর খেলতে পারে না। খেলার কথায় রানার মনে পড়ল জিনাত সুলতানার কথা। অদ্ভুত মেয়ে। এত রূপই ওর কাল হয়েছে। বারবার প্রবঞ্চনা পেয়েছে সে স্বার্থপর পুরুষের কাছ থেকে। মমতা হয় রানার।

শীত-শীত করছে। দোসরা মার্চ। বাংলায় ফাল্গুন মাস। কিন্তু শীতের আমেজ যায়নি। একটু বেশি রাতে তো রীতিমত শীত। ঘরের ভেতর চলে এল রানা। ওদিকের দরজাটা বন্ধ করে দিল। দুটো কামরা নিয়ে ওর সুইট। ড্রইংরুমের মধ্যে দিয়ে বেরোতে হয় বাইরে। দরজা বন্ধ আছে কিনা আরেকবার পরীক্ষা করে তিন ওয়াটের সবুজ বাতিটা জ্বেলে দিয়ে বাকি সব বাতি নিভিয়ে দিল রানা। দামী কম্বলের তলায় ঢুকে পাশ ফিরতে যাবে এমন সময় কান খাড়া হয়ে গেল ওর দরজায় মৃদু টোকা শুনে। আবার শব্দটা হতেই বুঝল কানের ভুল নয়।

মৃদু সাবধানী টোকা। কে হতে পারে? সোহেল? না শত্রুপক্ষ? নিঃশব্দ পায়ে দরজার পাশে এসে দাঁড়াল রানা। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল। অপর পারে ঠুন করে একটা হাল্কা আওয়াজ হতেই মৃদু হেসে বাতি জ্বালল রানা। চুড়ির আওয়াজ। দরজা খুলতেই ঘরে প্রবেশ করল জিনাত সুলতানা।

'কি ব্যাপার, জিনাত?'

কোনও উত্তর না দিয়ে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল জিনাত। তারপর ঘুরে দাঁড়াল রানার মুখোমুখি। রানার ওপর একবার আপাদমস্তক নজর বুলিয়ে নিয়ে ওকে পাশ কাটিয়ে শোবার ঘরে চলে এল সে। যেন নিজের বাড়ি। রানাও এল পিছন পিছন। ম্লান সবুজ আলো জ্বলছে, সুইচ টিপে উজ্জ্বল বাতি জ্বেলে দিল সে।

'কথা দিয়েও এলে না কেন?' জিনাতের কণ্ঠে তীক্ষ্ণ তিরস্কার। মুখোমুখি

দাঁড়িয়েছে সে রানার।

হাসল রানা। 'সুদে-আসলে টাকা ফেরত নিতে?' মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ। 'কার কাছে যাব বুঝতে পারছিলাম না—টাকাগুলো তো সব এখন ওয়ালী আহমেদের পকেটে। ভাবছিলাম তোমার ঘরে যাব, না ওর ঘরে!'

রানার আমুদে ভঙ্গি দেখে হেসে ফেলল জিনাত। তারপর আবার গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, 'আমি জানতে এসেছি—গেলে না কেন? মানুষ এমনিতেই সুযোগ নিতে চায়, আর তুমি তো টাকা দিয়েছ।'

'দেখো, জিনাত, মানুষের কথা ছেড়ে দাও। আমি কোনদিন পুরোপুরি মানুষ হতে পারিনি। সব কাজ সবাইকে দিয়ে হয় না—এখন তুমি যদি নিজ গুণে ক্ষমা করে দাও...'

'তাহলে টাকা দিলে কেন?'

'ওটা দিয়েছি অন্য কারণে।'

'দয়া? না পবিত্র প্রেম?' জিনাতের কণ্ঠে বিদ্রূপ।

'না। দয়া নয়, প্রেমও নয়—মমতা। তোমার মত আমিও অনেক আঘাত পেয়েছি, জিনাত। আমি জানি তোমার বেদনার গভীরতা। ভুল বুঝো না আমাকে, প্লীজ। আমি তোমাকে কৃপা বা দয়া করিনি।'

'তোমার মমতার কোনও প্রয়োজন নেই আমার, রানা। কারও মমতা আর আমাকে ফেরাতে পারবে না। একটা কথার সোজা উত্তর দেবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'তুমি অপমান করতে চাও আমাকে?' বিছানার উপর বসল জিনাত।

'না। ঢের অপমান পেয়েছ তুমি মানুষের কাছে। আর না।'

কয়েক মুহূর্ত রানার চোখের দিকে চেয়ে রইল জিনাত। যখন বুঝতে পারল কোনরকম কথার চালাকি নয়, আন্তরিক ভাবেই বলেছে রানা কথাটা, হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে দু'হাতে মুখ ঢাকল সে।

থতমত খেয়ে গেল রানা। কাঁদলেও কোনও মানুষকে এত সুন্দর লাগতে পারে, জানা ছিল না ওর। কিভাবে সান্ত্বনা দেবে বুঝতে না পেরে ওর কাঁধে একটা হাত রাখল।

'প্লীজ, জিনাত, কেঁদো না। প্লীজ, শান্ত হও। জিনাত...'

একটু সামলে নিয়ে রানাকে টেনে পাশে বসাল জিনাত।

'আমার হাতটা একটু ধরে থাকবে, রানা? আমি এখুনি চলে যাব। আমি চাই, তোমার স্পর্শের স্মৃতি আমার জীবনের শেষ স্মৃতি হোক।'

'তার মানে?'

কোনও জবাব দিল না জিনাত। রানা ভাবল, এই কথা বলছে কেন, আত্মহত্যা করবে নাকি মেয়েটা? কেন যেন মনে হলো, তাহলে মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে পৃথিবীর।

কয়েক মিনিটেই শান্ত হয়ে গেল জিনাত।

'তোমাকে এক কাপ কফি দিই?' জানতে চাইল রানা।

'নাহ্...আচ্ছা, ঠিক আছে।'

মিনি কিচেন থেকে দু'হাতে দু'কাপ কফি নিয়ে এসে দেখল রানা, তেমনি

অবসন্ন ভঙ্গিতে বসে আছে জিনাত। কফি পেয়ে খুশি হয়ে চুমুক দিল।

অপলক চোখে চেয়ে রইল রানা এই অদ্ভুত মেয়েটির দিকে। কি হয়েছে ওর? কিসের প্রচণ্ড ধাক্কায় চুরমার হয়ে গেছে মেয়েটির হৃদয়? সহ্যের শেষ প্রান্তে চলে গেছে, যেন এক্ষুণি ভেঙে পড়বে। কে এ?

রানাকেও অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল জিনাত। একটি কথাও না বলে কফি শেষ করল, তারপর উঠে দাঁড়াল। কথা বলার আগে ঠোঁট জোড়া একটু কাঁপল।

'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ, রানা। চলি। তোমার টাকাগুলো ফেরত পেয়ে যাবে কাল-পরশুর মধ্যেই। বিদায়।'

দরজা খুলে চলে গেল জিনাত।

ঘুম আসছে না কিছুতেই। ঘুরে ফিরে কেবল জিনাতের কথা ভাবছে রানা। কে এই মেয়েটি? ভেঙে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে পৌঁছে গেছে বেচারী। ওকে ফেরানো যায় না? রানার কাছ থেকে কোনও রকম সাহায্য গ্রহণ করতে রাজি নয় জিনাত। কিছুই কি করবার নেই ওর? কেন জানি নিজেকে বড় অযোগ্য মনে হলো রানার।

শুয়ে শুয়ে নানান কথা ভাবছে রানা। অনেক সময় পার হয়ে গেছে, টেরই পায়নি সে। ভোর হয়ে এসেছে। সাড়ে চারটে বাজে। মাথা থেকে সব চিন্তা দূর করে এবার ঘুমাবার চেষ্টা করল সে। কম্বলটা গলা পর্যন্ত টেনে নিয়ে পাশ ফিরে শুলো। সমস্ত শরীর ঢিল করে দিয়ে ডাকল ঘুমের সুষুপ্তিকে।

এমনি সময়ে বাইরে করিডরে কারও পায়ের শব্দ শুনতে পেল রানা। কেউ হেঁটে চলে গেল ওর ঘরের পাশ দিয়ে সিঁড়ি ঘরের দিকে। এত ভোরে কে যায়? জিনাত না তো! দরজাটা নিঃশব্দে খুলে একটু ফাঁক করে দেখল রানা। সত্যি, জিনাত। করিডরের মোড় ঘুরে সিঁড়ির দিকে চলে গেল সে। চুলগুলো আলুথালু। হাঁটার ভঙ্গিটা ক্লান্ত, অবসন্ন। যেন স্বপ্নের ঘোরে হাঁটছে শ্লথ পায়ে।

কাক-পক্ষীও ওঠেনি এখন। এই ভোর রাতে কোথায় চলেছে জিনাত? হঠাৎ একটা ভয়ঙ্কর কথা মনে আসতেই চমকে উঠল রানা। ছুটে গিয়ে একটা শার্ট গায়ে দিয়ে স্যাণ্ডেল পায়ে বেরিয়ে এল সে ঘর থেকে।

রানা যখন রাস্তায় নামল জিনাত তখন চলে গেছে অর্ধেক পথ। সেইলরস ক্লাবের পাশ দিয়ে সোজা সাগরের দিকে চলেছে সে। রাস্তা ছেড়ে বালিতে নামল জিনাত। আশেপাশে যদ্দূর দেখা যায় একটা জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। পুব দিকের আকাশটায় একটু ফরসা হয়ে আসার আভাস। আবছা কুয়াশায় বেশি দূর দেখা যায় না। দ্রুত হাঁটছে রানা। ওর চোখ দুটো স্থির ভাবে নিবদ্ধ সামনের মূর্তিটার উপর। মাথার মধ্যে দ্রুত চিন্তা। তাই একবারও ভাবল না সে পিছন ফিরে চাইবার কথা। চাইলে দেখতে পেত ঠিক বিশ গজ পিছন পিছন আসছে তিনজন ষণ্ডা-মার্কা লোক। সেই তিনজন।

নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করতে চলেছে জিনাত। রানা ভাবছে, কি বলা যায়? 'এ কি করছ, জিনাত?' বললে সোজা উত্তর আসবে 'তোমার মাথাব্যথা কিসের? তোমার নোংরা নাকটা না গলালে চলছে না?' যদি বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, 'আরে, তুমি

এখানে? তুমিও খুব ভোরে স্নান করো বুঝি!' কিংবা 'হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম। ভালই হলো, দেখা হয়ে গেল। চলো না আজ কোথাও আউটিং-এ যাই।' তাহলে অতিরিক্ত নাটকীয় হয়ে যায়। তাছাড়া সে যে পরিষ্কার মিথ্যে কথা বলছে, বুঝবে জিনাত। গায়ে পড়ে উপকারের চেষ্টা দেখে বিতৃষ্ণায় ভরে যাবে ওর মন।

তার চেয়ে সত্যি কথাটাই বলবে। 'তোমার পায়ের শব্দ শুনে পিছু নিয়েছি আমি, জিনাত। কিছুতেই মরতে দেব না আমি তোমাকে। আমার জন্যে বাঁচতে হবে তোমাকে। চলো আমার সঙ্গে।' যদি না আসে তাহলে কি জোর করে ধরে নিয়ে আসবে? কিন্তু তাতে বিপদের আশঙ্কা আছে। চিৎকার আর ধস্তাধস্তি করলে লোকজন জমা হয়ে পিটিয়ে লাশ করবে। কেলেঙ্কারি কারবার হয়ে যাবে। দেখা যাক, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা হবে।

সাগরের একেবারে কাছে চলে গেছে জিনাত। দৌড়াতে আরম্ভ করল রানা। ওর পায়ের তালে তালে পিছনের তিনজনও দৌড়াচ্ছে এখন। হাঁটু পানিতে নেমে গেছে জিনাত।

'জিনাত!' রানা ডাকল।

চমকে ফিরে চাইল জিনাত। দুই গাল বেয়ে জল পড়ছে ওর। আবছা কণ্ঠে বলল, 'কে! কি চাও তুমি?'

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল রানা, 'উঠে এসো, জিনাত। এভাবে মরতে পারবে না তুমি। কিছুতেই মরতে দেব না আমি তোমাকে।'

কি যেন বিড় বিড় করে বলল জিনাত, রানা বুঝতে পারল না। রানার কাঁধের ওপর দিয়ে ওর দৃষ্টিটা চলে গিয়েছে পিছনে। কি দেখছে পিছনে ভেবে যেই রানা পিছন ফিরতে যাবে ওমনি কথা বলে উঠল একজন উর্দুতে। আদেশের সুর সে কণ্ঠে।

'খবরদার! মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়াও। এক ইঞ্চিও নড়বে না!'

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। যমদূতের মত দাঁড়িয়ে আছে সেই তিনজন পাঠান। স্থির, নিশ্চল। খালি হাতে থাকলে হয়তো চেষ্টা করে দেখতে পারত রানা। কিন্তু দেখল তিন জনের হাতেই তিনটে চকচকে রিভলভার, ওর দিকে ধরা। ধীরে হাত তুলল সে মাথার উপর।

ব্যাপার কি? কারা এরা? সাধারণ চোর ছ্যাঁচোড় তো নিশ্চয়ই নয়। আজ তিনদিন ধরে লক্ষ রাখছে এরা ওর ওপর। ওর পরিচয় কি প্রকাশ পেয়ে গেল শত্রুপক্ষের কাছে? আজ এই ভোর রাতে যখন ধাওয়া করে এসেছে পেছন পেছন তখন নিশ্চয়ই কোনও মতলব আছে ওদের। কি চায় এরা? ওকে ধরিয়ে দেবার জন্যে মেয়েটিকে ওর জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে না তো?

এখানেই ওকে শেষ করে দেবার ইচ্ছে নেই বোঝা গেল। আওয়াজ শুনে হোটেল থেকে লোকজন বেরিয়ে আসবে, সেজন্যেই হয়তো, দু'জন রিভলভার ধরে থাকল, আর তৃতীয়জন তার রিভলভারটা পকেটে পুরে দ্রুত পরীক্ষা করল রানার সাথে কোন অস্ত্র আছে কিনা। কিচ্ছু নেই। রানা বুঝল এই সুযোগ। অন্তত কিছুক্ষণ দেরিও যদি করানো যায় তাহলে ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে কোন না কোন সাহায্য এসে

যেতে পারে। গুলি ওরা নেহাত নিরুপায় না হলে ছুঁড়বে না। খপ্ করে লোকটার ডান হাতটা কব্জির কাছে ধরেই বাম হাতে কনুইটা ঠেলে ওপর দিকে ওঠাল রানা। এটা যুযুৎসুর খুব সহজ একটা প্যাঁচ। বেকায়দা অবস্থায় পিঠের দিকে চলে এল হাত—শরীরের উপর দিক ঝুঁকে পড়ল সামনে। মাঝারি রকমের একটা চাপ দিতেই মুখ দিয়ে আল্লার নাম বেরিয়ে পড়ল লোকটার। আরেকটু জোরে চাপ দিলেই মড়াৎ করে ভেঙে যাবে কাঁধের হাড়। এমন সময় দেখা গেল একটা জিপ এগিয়ে আসছে বালির উপর দিয়ে।

রানা ভাবল, এইবার ব্যাটাদের দেখে নেবে। সোজা শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে বাছাধনেরা। জিপের আরোহী যে-ই হোক না কেন, নিশ্চয়ই ওর এই বিপদে সাহায্য করবে। কিন্তু মেয়েটা সম্পর্কে কি গল্প বানিয়ে বলবে সে? এই ভোর রাতে সাগর পারে কেন আসে একজন ভদ্রমহিলা? তার ওপর আলুথালু বেশ।

ওদের দেখতে পেয়েছে জিপের ড্রাইভার। সোজা এগিয়ে আসছে এদিকে। জয়ের উল্লাসে রানা বলল, 'এখনও সময় আছে, বাপ্। তোমরা দু'জন কেটে পড়তে পারো ইচ্ছে করলে—কিন্তু এই শালাকে ছাড়ছি না।'

কোন রকম ভাবান্তর হলো না রিভলভারধারীদের চেহারায়। একজন শুধু কাছে এসে চট্ করে তৃতীয়জনের রিভলভারটা তুলে নিল ওর পকেট থেকে। তারপর আবার কয়েক পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল নির্বিকার ভঙ্গিতে। জিপটা কাছে এসে থামতেই লাফিয়ে নামল আরও দু'জন। চুপসে গেল রানার উৎসাহ। চেহারা দেখেই বোঝা গেল একই দলের লোক।

এবার পরিষ্কার ইংরেজিতে একজন বলল, 'বাধা দিলে বেহুদা জখম হবে, মিস্টার। হাতটা ছেড়ে দিয়ে গাড়িতে এসে বসো।'

রিভলভার দিয়ে ইঙ্গিত করতেই জিনাত গিয়ে উঠে পড়ল জিপের পেছনে। রানা বুঝল বাধা দিয়ে এখন লাভ নেই। সে-ও ভালমানুষের মত গিয়ে বসল জিনাতের পাশে। রানার কাবু করে ফেলা তৃতীয়জন ড্রাইভারের পাশে বসল ডান কাঁধটা ডলতে ডলতে। বাকি চারজনও উঠে বসল গাড়ির পেছনে ঠাসাঠাসি করে। জিনাতকে অভয় দেয়ার জন্যে ওর বাহুতে একটু চাপ দিল রানা এক হাতে। আর একটু কাছে ঘেঁষে এল জিনাত প্রত্যুত্তরে।

একটা ব্যাপার রানা লক্ষ করল যে জিনাতের প্রতি এতটুকু অশ্লীল ইঙ্গিত করল না একটি লোকও। এমন কি ওর দিকে চোখ তুলেও চাইছে না কেউ। সাধারণত স্ত্রীলোককে হাতের মুঠোয় পেলে পুরুষ দুর্বৃত্ত যে ব্যবহার করে থাকে তার কিছুমাত্র প্রকাশ পেল না ওদের ব্যবহারে। দ্বিতীয়বার ভাবল রানা, জিনাত কি টোপ হিসেবে কাজ করল। ওরা একজনকে বন্দী করল, না দু'জনকেই? ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছে কেউ? নাকি কোনও প্রেমিক বা স্বামীর প্রতিশোধ? এর শেষ কি? নির্যাতন? খুন?

টাওয়ার ছাড়িয়ে ম্যাকলিওড রোডে পড়ল জিপ। নিউ স্টেট ব্যাঙ্ক বিল্ডিং পার হয়ে ঢুকল উডস্ট্রীটে, তারপর বার্নস্ রোড। নাজিমাবাদের দিকে চলেছে ওরা।

চমৎকার একটা দোতলা বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় এসে থামল জিপ। আরও চারজন পাঠান বেরিয়ে এল। একটিও বাক্য বিনিময় হলো না। চারদিক থেকে ঘিরে রানা এবং জিনাতকে নিয়ে যাওয়া হলো বাড়ির ভেতর। লোকগুলোর চলাফেরা

হাবভাব ঠিক চাবি দেয়া যন্ত্রের মত।

কিছুদূর গিয়েই বাঁয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। রানাও জিনাতের পিছু পিছু উঠতে যাচ্ছিল ওপরে। বাধা দিল একজন।

'তুম ইস্‌তারাফ্‌।'

ডানধারের দরজা দিয়ে ভারি একটা পর্দা তুলে ঢোকানো হলো রানাকে। চমৎকার সুসজ্জিত একটা ওয়েটিং-রুম। অতিথিদের অপেক্ষা করবার জন্যে। ঘরের চারকোণে পা-লম্বা টেবিলের উপর চারটে ফ্লাওয়ার ভাসে তাজা ফুলের তোড়া। ওপাশে আরেকটা ঘর। বোধহয় ড্রইংরুম। সেই দরজাতেও দামী পর্দা ঝোলানো।

রানাকে সম্পূর্ণ আওতার মধ্যে পেয়ে ওদের সতর্কতায় একটু ঢিল পড়েছিল। তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল রানা। পিছনে না চেয়েই ডান কনুইটা রেল এঞ্জিনের পিস্টনের মত সজোরে চালিয়ে দিল সে পিঠের সাথে ঘেঁষে থাকা লোকটার পেটের উপর সোলার প্লেক্সাসে। 'ঘোঁত্‌' করে একটা শব্দ বেরোল ওর মুখ দিয়ে। মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়ে টান দিয়ে রিভলভারটা বের করে নিল রানা ওর ওয়েস্টব্যাণ্ড থেকে। কেউ কিছু বুঝবার আগেই এক লাফে হাত চারেক পিছিয়ে এল সে।

'হ্যাণ্ডস্‌ আপ্‌! দুই হাত ঘাড়ের পিছনে তুলে দাঁড়াও সবাই।'

বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে হ্যামারটা তুলল রানা রিভলভারের। মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে একজন। বাকি তিনজন হতবুদ্ধি হয়ে গিয়ে হাত তুলে দাঁড়াল। আরও কয়েক পা পিছিয়ে গেল রানা। এমন সময় ঠিক কানের কাছে একটা মোলায়েম পুরুষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

'শাবাস, মাসুদ রানা! কিন্তু পেছন দিকটাও একটু খেয়াল রাখতে হয়। কেবল সামনের দিকে নজর রাখলে কি চলে? চারদিক সামাল দিতে পারলেই না বলব সত্যিকারের হুঁশিয়ার জওয়ান।'

গুরু গম্ভীর, কিন্তু ভদ্র মার্জিত কণ্ঠস্বর। রানা বুঝল হেরে গেছে সে। ভাবল, ঘুরে দাঁড়িয়েই গুলি করবে, যা থাকে কপালে! ঠিক যেন ওর চিন্তাটা বুঝতে পেরেই আবার কথা বলে উঠল পিছনের লোকটি। উর্দুর মধ্যে ফ্রন্টিয়ারের টান।

'আমাকে মেরে কোনও লাভ নেই, মিস্টার মাসুদ রানা। আমি আপনার শত্রু নই। তাছাড়া ঘুরে দেখুন, আমি নিরস্ত্র। আপনি আমার মেহমান। কেউ কিছু বলবে না আপনাকে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে রানা দেখল ডান হাতে পর্দাটা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক প্রৌঢ় পাঠান। পরিষ্কার করে গোঁফ-দাড়ি কামানো। মুখে স্মিত হাসি। প্রশস্ত কপালে বুদ্ধির ছটা। কানের কাছে চুলগুলোতে পাক ধরেছে। লম্বায় রানার চেয়ে ইঞ্চি চারেক ছোট হবে। কিন্তু প্রথম দর্শনেই বোঝা গেল অসুরের শক্তি আছে ওই পেশীবহুল দেহে। আর বুকের মধ্যে আছে দুর্জয় সাহস। রানা ঘুরতেই পিছন থেকে এগিয়ে আসছিল দুইজন। হাত উঠিয়ে থামতে ইশারা করল ওদের দলপতি। পশতু ভাষায় কিছু বলল। মাটি থেকে টান দিয়ে তুলল ওরা আহত সঙ্গীকে। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

'আসুন। ভেতরে আসুন, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনার সাথে অনেক কথা আছে আমার। কফি খেতে খেতে গল্প করা যাবে। আপনার হাতে রিভলভার

আছে। ইচ্ছে করলেই আমাকে খতম করে দিতে পারেন আপনি। কাজেই নিজেকে বন্দী মনে করবেন না। আমিই বরং আপনার বন্দী।'

হাসল ভদ্রলোক। অদ্ভুত আকর্ষণীয় হাসি। রানার মনে হলো কোথায় যেন দেখেছে আগে এই হাসি। কিন্তু স্মৃতির পাতা হাতড়ে এই মুখটা কিছুতেই মনে পড়ল না ওর। হাসিটার অদ্ভুত একটা সংক্রামক গুণ আছে। রানাও না হেসে পারল না। বহুদিন পর এমন সজীব, প্রাণবন্ত, ক্ষমতাবান একজন মানুষের মুখোমুখি হলো সে। লোকটার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ আছে, মুখের মধ্যে একটা বাল্‌ব ধরলে দপ্ করে জ্বলে উঠবে। নিজের অজান্তেই প্রসন্ন হয়ে উঠল রানার মনটা।

লোকটার পিছনে দরজার গায়ে ক্যালেণ্ডার ঝুলছিল একটা। মার্চ আর এপ্রিল মাস পাশাপাশি। হঠাৎ 'এপ্রিল ফুল' বলেই গুলি ছুঁড়ল রানা। পয়লা এপ্রিলের ছোট্ট চারকোণা ঘরের মধ্যে গিয়ে লাগল গুলিটা দলপতির কানের পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গিয়ে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল পাঠান ক্যালেণ্ডারটা।

'শাবাস্! বাঙ্গাল কা শের হো তুম, মাসুদ রানা।' অব্যর্থ লক্ষ্য দেখে তারিফ করল সে। তারপর হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'আমার নাম খান মোহাম্মদ জান। শুনেছেন কখনও?'

'না।' ইঁটের মত শক্ত হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলল রানা। নামটা চেনা চেনা লাগলেও মনে করতে পারল না সে কোথায় শুনেছে।

'তাই নাকি? আশ্চর্য। কিন্তু আপনার নাম-ধাম পরিচয় সব আমার নখ-দর্পণে। আপনি পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। এই ডিপার্টমেন্টে আসার আগে আপনি আর্মিতে মেজর ছিলেন। করাচি এসেছেন স্বর্ণমৃগ শিকার করতে। কি? ঠিক বলিনি?'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল মোহাম্মদ জানের মুখ। মুখে সংক্রামক হাসি।

রানা নিজের বিস্ময় গোপন করে জিজ্ঞেস করল, 'আর আপনি কোথাকার জ্যোতিষ্ক জানতে পারি?'

'আমি মালাকান্দের ট্রাইবাল চীফ।'

চার

এবার আর বিস্ময় গোপন করতে পারল না রানা। সম্ভ্রমের সঙ্গে দ্বিতীয়বার লক্ষ করল প্রাণবন্ত মুখটা।

এই সেই দুর্দান্ত খান মোহাম্মদ জান! বৃটিশের রাজত্বকালে যে কিনা ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। যার নাম বললেই পশ্চিম পাকিস্তানের ছেলে বুড়ো সবাই চেনে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে যার নাম ভীতির সঙ্গে স্মরণ করা হয়। এই সেই খান মোহাম্মদ জান!

এই লোক তাকে বন্দী করে এনেছে কেন? এর নামে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সে আলাদাভাবে একটা ফাইল রাখা আছে। সবাই জানে আফগানিস্তান, ইরান আর সোভিয়েট রিপাবলিকের দুর্বৃত্তদের সাথে এর মস্ত চোরাচালানী কারবার

আছে। কোটি কোটি টাকা উপার্জন করেছে সে এই উপায়ে। বিভিন্ন দেশের ব্যাঙ্কে জমা আছে এর অগাধ সম্পদের বেশ-অনেকখানি অংশ। অথচ কেউ কখনও আইনের প্যাঁচে ধরতে পারেনি একে বেকায়দা অবস্থায়। তার এলাকায় সে সম্রাট। পাকিস্তান সরকারও তাকে সব সময়ে ঘাঁটাতে সাহস পায় না।

এই কি তাহলে সোনা চোরাচালানকারীদের অদৃশ্য সর্দার? একেই খুঁজে বের করবার জন্যে পাঠানো হয়েছে তাকে ঢাকা থেকে?

'কই, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, মি. মাসুদ রানা? বসুন।'

একটা সোফায় বসে পড়ল রানা। গুলির শব্দে ছুটে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল কয়েকজন। মোহাম্মদ জান হাতে তালি দিতেই ঘরের ভিতর ঢুকে সালাম করল একজন; পশ্তু ভাষায় কিছুক্ষণ অনর্গল কথা বলল মোহাম্মদ জান। লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই রানাকে বলল, 'আপনার জন্যে পাশের বাথরুমে সব কিছু তৈরি আছে, মিস্টার রানা। টুথব্রাশ, সাবান, টাওয়েল, সবই নতুন। আপনাকে বলেছি, আমি আপনার শত্রু নই। আপনি নিশ্চিন্ত মনে মুখ হাত ধুয়ে আসুন। ততক্ষণে নাস্তা এসে যাবে। প্লীজ!'

'জিনাতকে কোথায় রেখেছেন?'

মৃদু হাসল মোহাম্মদ জান। বলল, 'চিন্তা করবেন না। ওকেও যত্নে রাখা হয়েছে।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে রানা দেখল একটা টেবিল লাগানো হয়েছে ঘরের মধ্যে। তার দু'পাশে দুটো চেয়ার। মস্ত একটা থালায় পাঁউরুটি টোস্টের পাহাড়। একটা বাটিতে মাখন ভর্তি। সাদা দুটো প্লেটে পাশাপাশি শুয়ে আছে প্রকাণ্ড সাইজের দুটো করে ধূমায়িত ওমলেট—চারটে ডিম দিয়ে তৈরি প্রতিটা। পাতলা করে কাটা টিনের পনির আছে একটা তস্তরির উপর। একটা দামী ফ্রুট সেটে উঁচু করে আঙুর, নাশপতি, আপেল আর মাল্টা— কিছু কাজুবাদাম আর আখরোট। সব মিলে টেবিলটা প্রায় ভরে যাবার যোগাড়। দশজন একসাথে চেষ্টা করলেও শেষ করতে পারবে না সব। মুখোমুখি বসল দু'জন দুটো চেয়ারে।

'মেজর মাসুদ রানা। আপনার সাথে যা আলোচনা করব তা গোপন রাখবেন বলে কথা দিতে হবে। একেবারে টপ্ সিক্রেট। রাজি?'

'তেমন কোনও কথা আমি দেব না। রাষ্ট্রের স্বার্থের বিরুদ্ধে যেতে পারে এমন কোন কথা আমাকে বললে সেটা আমার পক্ষে গোপন রাখা সম্ভব হবে না।'

'সেটা আমি ভাল ভাবেই জানি, মিস্টার মাসুদ রানা।' হাসল মোহাম্মদ জান। 'আপনার সম্পর্কে সব রকম রিপোর্ট নিয়েছি আমি। আপনার মত নীতিবান দেশপ্রেমিকের কাছে তেমন কোনও কথা আমি বলতেই বা যাব কোন্ সাহসে? আমি আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আলাপ করতে চাই। এই ধরুন, আমার একমাত্র কন্যা জিনাত সম্পর্কে।'

এইবার সত্যিই চমকে উঠল রানা। জিনাতের বাবা এই দোর্দণ্ড-প্রতাপ ট্রাইবাল চীফ? এতক্ষণে রানা বুঝল কেন হঠাৎ ফ্রন্টিয়ারের ক্ষমতাশালী এক সর্দার তার সাথে আলাপ করতে চায়। হাসিটাও চিনতে পারল সে এখন—অবিকল জিনাতের হাসি। রীতিমত নাটক জমে উঠেছে মনে হচ্ছে!

'তাহলে রাজি,' মৃদু হেসে বলল রানা।

'অনেক ধন্যবাদ। আপনার সম্পর্কে সরকারী রিপোর্টে বলে আপনি দায়িত্ববান বিশ্বস্ততমদের একজন। রিপোর্ট না পড়েও আপনার মুখ দেখেই সে কথা অনায়াসে বলে দিতে পারতাম আমি। সত্যিকার মানুষ বলতে আমি যা বুঝি, আপনি তাই। সব কথা খুলেই বলব আমি আপনাকে। তার আগে আসুন নাস্তার পালাটা শেষ করে নেয়া যাক।'

নাস্তার পর কফি এল। একটা চেস্টারফিল্ড প্যাকেট থেকে নিজে একটা নিয়ে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল মোহাম্মদ জান। রানা মাথা নাড়ল। নিজের সিগারেটে আগুন ধরিয়ে নিয়ে আরম্ভ করল মোহাম্মদ জান:

'আজ বারো বছর আমি বিপত্নীক। আর বিয়ে থা করিনি। মর্দানের সেরা সুন্দরীকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে এসে বিয়ে করেছিলাম আমি। এবং ভালবেসেছিলাম।

'মায়ের অভাবে আমার একমাত্র সন্তান এই জিনাত বখে যেতে পারে সেই ভয়ে ওকে লাহোরের সেরা বোর্ডিং স্কুলের হোস্টেলে রেখেছিলাম। ছুটি-ছাটায় বাড়ি আসত। ওদের শিক্ষা-দীক্ষায় আমি সন্তুষ্ট ছিলাম। সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পর্যন্ত ভালই ছিল। কিন্তু কলেজে উঠে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা বংশ-মর্যাদাহীন বড়লোকদের আলট্রা-মডার্ন সব ছেলেমেয়েদের সাথে মেলামেশা আরম্ভ করল জিনাত। খারাপ সংসর্গের এমনই গুণ, এক মাসের মধ্যেই লাজুক পাহাড়ী মেয়েটা বদলে গেল পা থেকে মাথা পর্যন্ত। চক্রবৃদ্ধি হারে খারাপ লোক এসে ভিড় করল ওর আশেপাশে। একেবারেই বখে গেল মেয়েটা। ফিল্ম লাইনে ঘোরাফেরা আরম্ভ করল। অনেক রাতে ফেরে হোস্টেলে। মাঝে মাঝে দু'একদিন ফেরেও না। হোস্টেলের সুপারের চিঠি আসতে আরম্ভ করল আমার কাছে। প্রথমে আমি বিশ্বাস করিনি ওদের নালিশ। নিজ সন্তানের ওপর সব পিতারই অমন অন্ধ বিশ্বাস থাকে।

'কিন্তু ফোর্থ ইয়ারে উঠে কলেজের এক ছোকরা প্রফেসরের সাথে বাথরুমে ধরা পড়ায় রাসটিকেট করা হলো ওকে।

'বিশ্বাস করুন, মি. রানা, এই একটি মাত্র মেয়ের দুঃখ হবে বলে বয়স থাকতেও আর বিয়ে করিনি আমি। ওকে চোখের মণি করে রেখে ওর মায়ের অভাব পূরণ করার চেষ্টা করতাম। যা চাইত, তাই পেত সে। এদিকে আমাকে সেই সময়টা দৌড়াদৌড়ির ওপর থাকতে হত। কয়েকটা কেসে গোলমাল হয়ে যাওয়ায় ধরা পড়বার উপক্রম হয়েছিল। ওর দিকে নজর দেবার সময় তেমন পেতাম না। নিজেকে শেষ করে ফেলল সে। সব ব্যাপার দেখে-শুনে এবার আমি কঠিন হবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু হিতে বিপরীত হলো। আরও অবাধ্য হয়ে উঠল সে। হাত খরচের টাকা কমিয়ে দিলাম। তার ফলে আমার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যেই বোধহয় সে প্রেমিকদের কাছে টাকা নিতে আরম্ভ করল, যেখানে-সেখানে ধার করতে আরম্ভ করল।'

সিগারেটটা অ্যাশট্রে-তে ফেলে চুপচাপ কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল মোহাম্মদ জান। বোধহয় গুছিয়ে নিল কথাগুলো মনের মধ্যে।

'কিন্তু যত যা-ই করুক, ওর মনের একটা দিক নিরন্তর চাবুক মারত ওকে।

হাজার হোক ভাল বংশের মেয়ে। বিবেক দংশন আরম্ভ হলো ওর মধ্যে। নিজেকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করল। ঠিক সেই সময়েই বোধহয় আত্মহত্যার বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল ওর মধ্যে। নিজেকে শুধরাবার চেষ্টা করল জিনাত। জীবনে শান্তি পাওয়ার আশাতেই বোধহয় এক ফিল্মস্টারকে বিয়ে করে বসল হঠাৎ আমাকে না জানিয়ে। ফিল্ম-লাইন পছন্দ না করলেও আমি খুশি হয়েছিলাম ওর এই পরিবর্তন দেখে। এক কোটি টাকার উপঢৌকন পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু বছর দু'য়েক হলো ওর সমস্ত টাকা-পয়সা, গয়না-গাটি চুরি করে পালিয়ে গেছে সেই হিরো বোম্বেতে নাম করবার আশায়। জিনাতের কোলে তখন তিন মাসের একটা শিশু।'

চুপচাপ মন দিয়ে শুনছে রানা রহস্যময়ী মেয়েটার পূর্ব ইতিহাস।

'অনেক টাকা পয়সা খরচ করে এবং ভয় দেখিয়ে আমি তালাক আদায় করি সেই হিরোর কাছ থেকে। মারীতে একটা বাড়ি কিনে দিলাম জিনাতকে। মনে হলো যেন শান্তি পেল মেয়েটা। বেশ ছিল বাচ্চাকে নিয়ে বিভোর হয়ে। কিন্তু অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়। আজ আট মাস হলো হঠাৎ একসাথে ডাবল নিউমোনিয়া আর ব্যাসিলারি ডিসেনট্রি হয়ে মারা গেছে বাচ্চাটা।

'আপনাকে কি বলব, মিস্টার রানা। আমার একমাত্র আদুরে জিদ্দি মেয়েটার কপালে খোদা ভাল যেটুকু লিখেছিল, সে-সময় বোধহয় কলমে তার কালি ছিল না।

'এই চরম আঘাত পেয়ে সমস্ত পৃথিবীর ওপর খেপে গেল মেয়েটা। কিছুতেই আর আপস করবে না। ধ্বংস করে ফেলবে নিজেকে। আবার ফিরে গেল সে তার আগের জীবনে। আজ এখানে কাল ওখানে-পাগলের মত সে জীবনটা চেখে নিতে চাইল শেষ বিদায়ের আগে। আমি অনেক চেষ্টা করলাম ওর সাথে দেখা করবার, কথা বলবার। কিন্তু হলো না! বারবার এড়িয়ে চলে গেল ও। কিছুতেই সন্ধি করবে না সে নিষ্ঠুর জীবনের সাথে। আমিও পাগলের মত খুঁজে বেড়াতে থাকলাম ওকে। লোক লাগালাম চারদিকে। কিন্তু আমি পেশোয়ার পৌঁছতে পৌঁছতে ও চলে যায় পিণ্ডি, পিণ্ডি পৌঁছলে খবর পাই চলে গেছে লাহোর। কিছুতেই ধরতে পারি না ওকে। কিছুদিন একেবারে গায়েব হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ খবর এল ও করাচির বীচ্ লাগ্জারি হোটেলে একটা রুম রিজার্ভ করেছে। ছুটে এলাম করাচি। পাহাড়ী দেশের মানুষ আমরা, সাগরকে সব সময় ভয় পাই। যখন শুনলাম ও সাগর পারের হোটেলে উঠেছে তখন থেকে আধমরা হয়ে আছি আমি, মিস্টার রানা। জানলাম, দ্রুত সময় ফুরিয়ে আসছে। যে কোনও মুহূর্তে আমার হাত ফসকে চলে যাবে ও নাগালের বাইরে, চিরতরে।'

একটানা এতক্ষণ কথা বলায় দুই কষায় ফেনা জমেছে মোহাম্মদ জানের। রুমাল দিয়ে মুছে নিল সেটা। আরেকটা সিগারেট ধরাল। কিছুক্ষণ চুপচাপ টানল সিগারেটটা।

'আপনাকে আজ আমার বুকে চেপে রাখা এতদিনকার গোপন কথা বলতে পেরে মনটা যে কতখানি হালকা হয়ে গেল, মিস্টার রানা, বোঝাতে পারব না! যাক্, যা বলছিলাম, কড়া নজর রাখলাম আমি ওর ওপর।'

হোটেলের সেই তিনজন লোকের কথা মনে পড়ল রানার।

'ওর প্রতিটা পদক্ষেপ আমার লোক লক্ষ করেছে। এবং প্রতি দশ মিনিট অন্তর

অন্তর টেলিফোনে জানিয়েছে আমাকে। আপনাকে ধন্যবাদ জানানো হয়নি এখনও। জিনাতকে টাকা ধার দিয়ে সাহায্য করবার জন্যে আমি আপনার কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞ।'

'সাহায্য তো নয়, বরং ক্ষতিই হয়েছে। সব টাকা হেরেছে,' বলল রানা।

'কিছু বলা যায় না, মেজর। কিছুই বলা যায় না। কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ তা এক ওপরওয়ালাই জানেন। আমরা তার কি বুঝি? যাক, যা বলছিলাম। এই বাড়িতে বসেই ওর গতিবিধি আমার নখদর্পণে ছিল। সব খবরই জানি আমি। বমি করে ঘর ভাসানো, আপনার সাহায্য করতে এগিয়ে আসা থেকে নিয়ে রাত পোনে একটায় আপনার ঘরে জিনাতের প্রবেশ এবং দেড়টায় প্রস্থান—কিছুই আমার অজানা নেই।'

অস্বস্তি বোধ করল রানা। একটু নড়ে চড়ে উঠল। হাত উঠিয়ে যেন অভয় দিল ওকে সর্দার।

'এতে লজ্জা পাওয়ার কিছুই নেই, মেজর রানা। ব্যাটা-ছেলের এতে লজ্জার কিছুই নেই। আর আমার মেয়েও কচি খুকি নয়। তাছাড়া কে জানে, হয়তো…যাক, সে কথায় পরে আসছি। এমনও হতে পারে গত রাতের ঘটনাটাই ওর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে। হয়তো এটা একটা চিকিৎসার কাজই করল ওর ওপর।'

এইবার খানিকটা আঁচ করতে পারল রানা কেন ওকে ধরে আনা হয়েছে। এর আসল রহস্যটা কোথায়। কেন জানি একবার শিউরে উঠল ওর সর্বশরীর। যেন কেউ হেঁটে চলে গেল ওর কবরের ওপর দিয়ে।

'গত দুই দিনেই আমি আপনার সম্পর্কে সব তথ্য জোগাড় করে ফেললাম।'

'কিভাবে?' চট্‌ করে জিজ্ঞেস করল রানা।

হাসল খান মোহাম্মদ জান ওর সেই সংক্রামক হাসি।

'সেটা যদিও আমার বলা উচিত না, তবু বলব আপনাকে। কারণ আমি যদি খবর বের করতে পেরে থাকি, অন্যেও পারবে। এটা আপনার নিরাপত্তার ওপর স্পষ্ট হুমকি। কিন্তু এসব কথা পরে হবে। আগে এই প্রসঙ্গ শেষ করে নিই।'

আবার দু'কাপ কফি এল। লোকটা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত চুপ করে থাকল খান মোহাম্মদ জান।

'আপনার সম্পর্কে যা রিপোর্ট পেলাম এবং টেলিফোনে যা খবর পেলাম তাতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠলাম আমি। রাত দুটো পর্যন্ত চিন্তার পর ওদের জানালাম, আপনার সাথে দেখা করতে চাই আমি। আপনার অনেক সময় নষ্ট হলো, সেজন্যে এই জোড় হাত করে মাফ চাইছি আমি। আপনি হয়তো মনে করেছিলেন বিপদে পড়েছেন, সেজন্যেও ক্ষমা চাইছি। কিন্তু এছাড়া আমার কোনও উপায় ছিল না, মিস্টার রানা।'

'আর কোনও উপায়ে কি আমার দেখা পাওয়া সম্ভব ছিল না?' একটু রুষ্ট কণ্ঠে বলল রানা।

উঠে এসে রানার বাহুর ওপর হাত রাখল মোহাম্মদ জান।

'সেজন্যে তো মাফই চাইছি, মেজর। একটা আকুল পিতৃ-হৃদয়ের উদ্বেগের সাথে পরিচয় হতে আপনার দেরি আছে অনেক। আরও পঁচিশটা বছর যাক, তখন বুঝবেন। তাছাড়া একটু পরেই বুঝবেন ব্যাপারটা কত জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'

ডেকে আনতে বললে যে ওরা একেবারে বেঁধে নিয়ে আসবে তা অবশ্য আমার জানা ছিল না। কিন্তু এর প্রয়োজনও ছিল। এই চিঠিটা পড়লে আর আমাকে দোষ দিতে পারবেন না। এই নিন, পড়ে দেখুন।' পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে দিল মোহাম্মদ জান। 'যেই জিনাত রওনা হয়েছে সাগরের দিকে ওমনি আমার লোক ওর সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে এসেছে এখানে। এই চিঠিটা ছিল ওর টেবিলের ওপর। আপনিও তো কিছু সন্দেহ করেছিলেন, তাই না? এখন দেখুন।'

ছোট্ট চিঠিটা উর্দুতে লেখা। রানা পড়ল:

আব্বাজী,

এছাড়া আমার আর কিছুই করবার ছিল না। শুধু একটু খারাপ লাগছে একজনের জন্যে—ও আমাকে ভাল করতে চেয়েছিল। লোকটা বাঙালী। নাম মাসুদ রানা। ওকে খুঁজে বের করে দশ হাজার টাকা দিয়ে দিয়ো। আমি ধার নিয়েছিলাম। আর তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। বিদায়।

জিনা।

চিঠি থেকে চোখ তুলে চাইল রানা। উদগ্রীব একজোড়া চোখ চেয়ে আছে ওর মুখের দিকে। ফেরত দিল রানা চিঠিটা। ভাঁজ করে পকেটে রাখল সেটা মোহাম্মদ জান। তারপর হঠাৎ রানার ডান হাতটা তুলে নিল নিজের দুই হাতে।

'মাসুদ রানা। আপনি সমস্ত কাহিনী শুনলেন। প্রমাণও দেখলেন। খোদা জানে, এর মধ্যে একবিন্দু মিথ্যে কথা নেই। একটু দয়া করবেন আমার ওপর? মেয়েটাকে রক্ষা করতে একটু সাহায্য করবেন আমাকে? বলুন?'

করুণ মিনতি সর্দারের চোখে-মুখে। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে টেবিলের উপর রাখল রানা। কপালে ঘাম দেখা দিল ওর। টেবিলের উপর রাখা হাতের দিকে চেয়ে রয়েছে সে—চোখ তুলল না। মনে মনে ভাবছে, এ কি ফ্যাঁকড়ায় পড়ল সে। সে তো ডাক্তার নয়। সে কী সাহায্য করবে? যেন হাতের সাথে কথা বলছে এমনি ভাবে বলল, 'আমার মনে হয় না আমি তেমন কোনও সাহায্য করতে পারব। আপনার কি মনে হয়?'

উত্তেজনায় খান মোহাম্মদের কপালের দুটো শিরা ফুলে উঠেছে। গলার স্বরে একটা জরুরী ভাব আর সেইসাথে কাতর অনুনয় ফুটে উঠল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'আমি চাই তুমি আমার মেয়ের সাথে প্রেম করো, ওকে বিয়ে করো। আমি তোমাকে তিন কোটি টাকা দেব যৌতুক হিসেবে।'

ছ্যাঁৎ করে জ্বলে উঠল রানা।

'বাজে বকছেন আপনি, সর্দার। মেয়েটি ভুগছে মানসিক ব্যাধিতে। ভাল ডাক্তার দেখান। কাউকে বিয়ে করব না আমি—আর কারও টাকারও আমার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট রোজগার করি আমি।'

একটু থেমে শান্ত গলায় আবার বলল, 'জিনাতকে আমি পছন্দ করি। ওকে কোন রকম সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু ও অসুখ থেকে সেরে উঠলেই কেবল ওর সাথে আমার প্রেম বা বিয়ের কথা উঠতে পারে। তার আগে নয়। আমি একজন দুরন্ত প্রকৃতির লোক—শত্রু আর বিপদ নিয়ে আমার কারবার, আপনি জানেন। কারও সেবা-শুশ্রূষা করবার ক্ষমতা বা ধৈর্য আমার নেই। ওর চিকিৎসা

দরকার, সর্দার। আপনি যে ভাবে ওকে সাহায্য করতে চাইছেন তাতে হিতে বিপরীত হতে পারে। বুঝতে পারছেন না আমার কথাটা?'

চুপচাপ শুনল কথাগুলো মোহাম্মদ জান রানার চোখের উপর চোখ রেখে। তারপর নরম গলায় বলল,'বুঝতে পেরেছি। আপনার সাথে আমি তর্ক করব না। আপনি যেমন বললেন, ঠিক তেমনি করব আমি। কিন্তু দয়া করে শুধু একটা অনুগ্রহ করবেন?'

'কি?'

'আজ সারাটা দিন ওর সাথে কাটিয়ে ওকে শুধু এটুকু বুঝিয়ে দেবেন, ওকে পছন্দ করেন আপনি, ওর প্রয়োজন আছে বেঁচে থাকবার, আবার দেখা হবে আপনাদের। যদি আপনি ওকে একটু আশা, একটু ভরসা দিতে পারেন, তাহলে বাকিটা আমি পারব বোঝাতে। আমার জন্যে এটুকু করবেন না আপনি, মেজর রানা?'

ব্যস? এইটুকুতেই খুশি? রানার বুকের উপর থেকে যেন পাথর সরে গেল একটা। তাহলে জোর করে ওর কাছ থেকে কিছুই আদায় করতে চাইছে না এই ক্ষমতাশালী ট্রাইবাল চীফ?

'নিশ্চয়ই!' বলল রানা। 'এটুকু তো নিশ্চয়ই করব আমি। কিন্তু আমি মাত্র তিনদিন আছি করাচিতে। এরপর আপনাকে গ্রহণ করতে হবে ওর ভার।'

মোহাম্মদ জানের মুখে হাসি ফুটল আবার।

'এতক্ষণ পর! উঃ! এতক্ষণ পর একটু আশার আলো দেখালে, বাবা। তিন দিন যথেষ্ট। তারপর নিশ্চয়ই আমি ওর ভার নেব।' রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছল মোহাম্মদ জান। 'তোমাকে ধন্যবাদ জানাবার কোনও ভাষা নেই আমার, মেজর রানা। তুমি বাঁচালে আমাকে। কিন্তু তোমার জন্যে কিছু করবার সুযোগ দেবে না আমাকে? আমার অনেক বুদ্ধি, অনেক টাকা আর অ-নে-ক ক্ষমতা আছে। সবই এখন তোমার। এমন কি কিছুই নেই যা আমি তোমার জন্যে করতে পারি?'

হঠাৎ রানার মনে পড়ল তার কাজের কথা।

'একজন লোককে খুঁজছি আমি। লোকটা—'

'বুঝেছি। স্বর্ণমৃগ। আজই রাত দশটায় হোটেলে থেকো—তোমাকে নিয়ে যাব এক জায়গায়। সেখানে ওর খবর মিলতে পারে। তাছাড়া আমি এক্ষুণি চারদিকে লোক লাগিয়ে দিচ্ছি। এ কাজটা আমার হাতে ছেড়ে দাও।'

উঠে দাঁড়াল মোহাম্মদ জান। রানাও উঠে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ দুই হাতে জড়িয়ে ধরে রানার দুই গালে চুমো খেলো মোহাম্মদ জান। কিন্তু সেই মুহূর্তে ঘরে এসে ঢুকল জিনাত সুলতানা। জিনাতকে দেখেই লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি রানাকে ছেড়ে দিয়ে দূরে সরে দাঁড়াল সে।

পাঁচ

বেলা নয়টার দিকে স্নান সেরে সবচেয়ে দামী ট্রপিক্যালের নীল স্যুটটা পরে নিল

রানা। শেষ বারের মত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখে নিল টাইয়ের নট-টা বাঁকা হয়ে আছে কিনা। এমনি সময় কমলা রঙের একটা চমৎকার দামী কাতান শাড়ি পরে ঢুকল জিনাত রানার কামরায়।

হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল দু'জন রাস্তায়। লাউঞ্জে দেখা হয়ে গেল ওয়ালী আহমেদের সাথে। লিফটের দিকে যাচ্ছিল সে। থেমে দাঁড়িয়ে দেখল দু'জনকে হাত ধরাধরি করে হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে। বিচিত্র এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

'কোন্ দিকে যাবে, জিনাত?'

'তুমি যেদিকে যাবে সেদিকে।'

'গান্ধী গার্ডেন দেখেছ?'

'না। চলো না যাই? অনেক শুনেছি এই গার্ডেনের কথা।'

'বেশ। প্রথমে ওখানেই চলো।'

হাতের ইশারায় ট্যাক্সি ডাকল রানা। চকচকে নতুন ট্রায়াম্প হেরাল্ডের ছাদ হলুদ করা। থামল এসে ওদের সামনে। মিটার ডাউন করে নিল ড্রাইভার। দরজা মেলে ধরল। পিছনের সীটে উঠে বসল ওরা দু'জন।

ঠিকই বলেছিল খান মোহাম্মদ জান। ইতিমধ্যেই মস্ত পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে জিনাতের ভেতর। জীবনের সবকিছুর প্রতি সেই ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টিভঙ্গিটা আর দেখতে পেল না রানা। সহজ-স্বচ্ছন্দ একটা ভাব ফিরে এসেছে ওর মধ্যে। প্রথম লক্ষণ, কাটা কাটা বাঁকা কথার বদলে স্বাভাবিক নারীসুলভ কথার খৈ ফুটছে ওর মুখে। অনর্গল কথার ফুলঝুরি। আর অকারণ উচ্ছল হাসি।

সারাটা গান্ধী গার্ডেনে খুশির বন্যা বইয়ে দিল ওরা। জেব্রাগুলোকে বুট খাওয়াল জিনাত, উটের পিঠে চড়ল, বানরগুলোকে দিল কলা—তার থেকে রানা একটা খেয়ে ফেলায় রানার মনুষ্যত্বে ঘোর সন্দেহ প্রকাশ করল।

বেলা সাড়ে-দশটায় লোকজনের ভিড় নেই গার্ডেনে। এই অসময়ের নিরিবিলিতে ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে গোটা কয়েক কলেজ পালানো জুটি দেখা গেল। জায়গায় জায়গায় শান বাঁধানো বসবার ব্যবস্থা আছে গাছের তলায়। তারই একটায় বসে রয়েছে পাঞ্জাবী-পাজামা পরা বাবরি-চুলো এক ভাবুক। ফিলসফার না ফিল্মী গানের গীতিকার ঠিক বোঝা গেল না। গাছের ডালে চিল বসে ছিল একটা—নিশ্চিন্ত মনে এক লাদা পায়খানা করল। আর, পড়বি তো পড় সোজা ভাবুকের চাঁদির উপর। চমকে উঠে মাথায় হাত দিয়েই কালো হয়ে গেল ভাবুকের মুখ। হেসে খুন হয়ে গেল জিনাত।

'আজব জানোয়ার' লেখা একটা তাঁবুতে ঢুকল ওরা দুই আনার টিকিট কেটে। মুখটা মানুষের আর দেহটা শেয়ালের। মুখে একগাদা স্নো-পাউডার-রুজ-লিপস্টিক লাগানো। ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। রানার গা ঘেঁষে দাঁড়াল জিনাত। এক হাতে খামচে ধরল কোটের হাতা। ভয় পেয়েছে। খেলা যে দেখাচ্ছিল, সেই লোকটা এগিয়ে এসে জন্তুটিকে জিজ্ঞেস করল, 'ক্যায়া নাম হ্যায় তুমহারা?'

'মামতাজ বেগাম,' উত্তর এলো নাকি গলায়।

'ঘর কাঁহা?' আবার জিজ্ঞেস করল লোকটি।

'আফ্রিকা,' উত্তর এল আবার।
'খাতি হো ক্যয়া?'
'কাম্লা।'
'পিতি হো ক্যয়া?'
'দুদ।'
রানা লক্ষ করল ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে ওঠা নামা করছে শেয়ালের পেটটা, কিন্তু কথা বলবার সময় থেমে যাচ্ছে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে। কৌশল করে বানিয়েছে এই ভোজবাজি।
'পাঁও যারা হিলাও দেখে?'
পা নড়াচ্ছে জন্তুটা।
'হাঁথ যারা হিলাও দেখে?'
আর দেখাতে হলো না। একটানে রানাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল জিনাত তাঁবু থেকে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখ। অন্তত বিশ কদম দূরে না সরে মুখ খুলল না সে।
'ওরেব্বাপরে-বাপ! এখনও আমার বুকের ভেতর ধুক-ধুক করছে!' উত্তেজিত জিনাতের কণ্ঠস্বর। পিতার মতই সজীব প্রাণবন্ত ওর প্রতিটি কথাবার্তা, কার্যকলাপ।
প্রকাণ্ড চিড়িয়াখানাটা শেষই হতে চায় না। অনেক ঘুরল দু'জন।
রানার হাজার পীড়াপীড়িতেও সিগারেট খেলো না জিনাত। বলল, 'আমি ভাল হতে চাই, রানা। তুমি বলেছ, কিছুতেই মরতে দেবে না আমাকে। সারা সকাল ধরে খালি এই কথাটাই ভাবছি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছি আমি তোমার হাত ধরে। তোমার জন্যে বাঁচব আমি।'
একটু থেমে আবার বলল, 'কিন্তু এত কালি, এত কলঙ্ক! তুমি আরও আগে এলে না কেন, রানা? ফুলের মত নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক হয়ে যদি আসতে পারতাম তোমার কাছে!'
'কলঙ্ক তো চাঁদের অলঙ্কার, জিনাত।' বলল রানা, 'চাঁদের দেহটা কলঙ্কিত। কিন্তু আলোটা? এমন স্নিগ্ধ পবিত্র আছে কিছু আর? মানুষের দেহটা তো বাইরের জিনিস—মনের বিচারই আসল বিচার। তাই না?'
'তুমি তাই মনে করো? সত্যিই?'
'হ্যাঁ। মানুষের মনটাই সব।'
'বোম্ ভোলানাথ!'
চমকে উঠল রানা ও জিনাত একসাথে। গুরু-গম্ভীর কণ্ঠস্বর। কাছেই। ঝোপের ওপাশে কম্বলের ওপর পদ্মাসনে বসে আছে সাধু বাবা। আশে-পাশে সাত আটজন চেলা জুটে গেছে। বসে আছে ওরা তীর্থের কাকের মত সাধুজীর মুখের দিকে চেয়ে।
সাধুবাবার চোখ বন্ধ। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। একটা নোংরা পুরু কম্বল গায়ে জড়ানো। পাশেই পিতলের চকচকে লোটা আর সিঁদুর চর্চিত ত্রিশূল। সামনে ধুনো জ্বলছে। আশে পাশে প্রচুর উপহার সামগ্রী ফলমূল পড়ে আছে অনাদর অবহেলায়। বোঝা গেল আসল সাধু—এসবের উপর লোভ নেই কোনও।

'বোম্ ভোলানাথ!'

ধীরে ধীরে চোখ মেলল সাধুজী। মৃদু গুঞ্জন উঠল মাড়োয়াড়ী ভক্তদের মধ্যে। কে কার আগে কৃপাদৃষ্টি লাভ করবে তাই নিয়ে ঠেলাঠেলি লেগে গেল নিজেদের মধ্যে। সবাই এগিয়ে বসতে চায়। একটি বাণীও যেন ফসকে না যায়।

ওদের কারও দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সোজা চাইল সাধুজী রানার চোখের দিকে। প্রচুর গঞ্জিকা সেবনে চোখ দুটো লাল। যেন ভস্ম করে দেবে, এমন চাহনি। মুচকে হাসল রানা। ব্যাটা সোহেল! এই গান্ধী গার্ডেনেই তাহলে আড্ডা গেড়েছে শালা।

চট্ করে সাধুজীর চোখ সরে গেল রানার চোখের উপর থেকে। বোধহয় হাসি সামলাবার জন্যে। জিনাতের প্রতি এবার স্নেহ বর্ষণ করল যেন সাধুবাবার চোখ।

'জনম-দুখিনী তুমি, মা। এসো তো এগিয়ে, দেখি।'

প্রথম দর্শনেই ভক্তি এসে গিয়েছে জিনাতের। পায়ে পায়ে এগোল সে সাধুর দিকে। ভক্তেরা সরে গিয়ে পথ করে দিল।

'চলো, জিনাত,' রানা ডাকল, 'এখান থেকে যাই আমরা।'

'দুই মিনিট। প্লীজ! এসো না, তোমার হাতটাও দেখিয়ে নিই সাধুবাবাকে দিয়ে।'

'না।' গ্যাট্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা। সোহেলেরই জয় হলো। এগিয়ে গেল জিনাত রানাকে পেছনে ফেলে। উচ্চ মার্গের একটা অনাবিল হাসি হাসল সোহেল।

'বিশ্বাসে মিলয়ে হরি তর্কে বহুদূর।'

'ঠিক, ঠিক।' সায় দিল ভক্তেরা।

জিনাত এগিয়ে গিয়ে পদধূলি গ্রহণ করল।

'পাহাড়ী দেশের মেয়ে তুমি, মা। সাগর থেকে উঠে এসেছ। সবই ভোলানাথের ইচ্ছে। বোম্, ভোলানাথ! ভাগ্যের জুয়া খেলায় টাকা গেছে, কিন্তু মিলে গেছে মনের মানুষ, সোনার ময়না পাখি। কি? ঠিক বলিনি, মা?'

'সব মিলে গেছে!' ভয়-ভক্তিতে বুজে এল জিনাতের কণ্ঠস্বর। আবার একবার সাধুজীর পদধূলি গ্রহণ করল সে। একেবারে খাঁটি সাধু। ভক্তদের একজন বলল, 'বাঙাল মুলুক থেকে এসেছেন বাবা, হিংলাজ যাবেন। আসলি সাধু। সবাইকে সব কথা ঠিক ঠিক বলে দিয়েছেন।'

স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল সাধুর মুখ। বলল, 'কিন্তু পাখি থাকবে না, মা। উড়ে যাবে। ইচ্ছে করলেই কি কাউকে ধরে রাখা যায়? এ সুযোগ পেলেই খাঁচা কেটে উড়ে যাবে।'

সভয়ে চাইল একবার জিনাত রানার দিকে। এখনই উড়ে গেছে কিনা দেখবার জন্যেই বোধহয়। কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'একে ধরে রাখার কোনও উপায় নেই, বাবা?'

'আছে,' বিচিত্র এক হাসি ফুটে উঠল সাধুজীর ঠোঁটে। ত্রিশূলটা ধরল সে জিনাতের বুকের উপর। তারপর বলল, 'জুয়াড়ী থেকে সাবধান থাকতে বোলো তাকে। আর এই শিকড়টা সাথে রাখো। যখনই জল খাবে এটা একবার করে ডুবিয়ে নিয়ে তারপর খাবে। বোম্ ভোলানাথ।'

ভক্তিভরে কপালে ঠেকাল জিনাত যষ্টিমধুর শেকড়টা। তারপর ব্যাগে রেখে দিল সযত্নে। একশো টাকার একটা নোট বের করে সাধু বাবাজীর পায়ে একবার ছুঁইয়ে ঢুকিয়ে দিল কম্বলের তলায়।

আড়চোখে একবার নোটটার দিকে চেয়েই হুঙ্কার ছাড়ল বাবাজী, 'বোম্ ভোলানাথ।' তারপর তীব্র দৃষ্টিতে একবার রানার দিকে চেয়েই ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ল চোখ বুজে। মুখে প্রশান্ত হাসি।

দুপুরে হোটেল মেট্রোপোলে লাঞ্চ সেরে নিল ওরা। ওয়েট নিল দশ পয়সা দিয়ে। দু'জনের দুটো কার্ড বেরিয়ে এল। জিনাতের ওজন উঠল ১১৫ পাউণ্ড। ভবিষ্যদ্বাণী লেখা: ধৈর্য্য ধরুন। আপনার সুখের দিন আসিতেছে।

ওজন দেখে মাথা নেড়ে বলল জিনাত, 'অসম্ভব! যন্ত্রে ভুল আছে। একশো দশের বেশি কিছুতেই হতে পারে না।' কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী পড়ে খুশি হয়ে উঠল।

রানার ওজন ১৬০ পাউণ্ড। ভবিষ্যদ্বাণী: সাবধান! আপনার সামনে পিছনে শত্রু রহিয়াছে।

এটা পড়েই মুখটা কালো হয়ে গেল জিনাতের।

গাড়িতে উঠে হঠাৎ একসময়ে জিনাত বলল, 'ওহ্-হো। ভুলেই গিয়েছিলাম। আব্বাজী দশ হাজার টাকা দিয়েছে তোমাকে ফেরত দেবার জন্যে। এক্ষুণি দেব?'

'ওঁর কাছ থেকে কেন নেব? ও-টাকা নেব না আমি। ওটা তোমার জীবনে প্রবেশ করার এন্ট্রি-ফী। ওর বদলে তোমাকে পেয়েছি।'

'টাকা দিয়ে কি কারও মন পাওয়া যায়? যা পেয়েছ, এমনি অকারণেই পেয়েছ। তুমি টাকাটা না নিলে আমি বকা খাব বাড়ি ফিরে।'

'তাহলে আর বাড়ি ফিরো না। থেকে যাও আমার সাথে। চিরকাল।'

রানার হাতটা হাতে তুলে নিল জিনাত।

'তোমাকে এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করতে না হলে বেঁচে যেতাম আমি। কিন্তু আব্বাজী বলে দিয়েছে সন্ধের পর বাড়ি ফিরতে হবে। তোমাদের নাকি কি কাজ আছে? কিন্তু তুমি অন্য কথা বলে ভুলিয়ে দিচ্ছ আমাকে। টাকাটা ...'

'ও-টাকা আমি নেব না, জিনাত।'

'তোমার কসম লাগে, রানা। প্লীজ।'

'আচ্ছা। যদি নেহায়েত ফেরত দিতেই চাও, তাহলে একটা কায়দা শিখিয়ে দিতে পারি আমি।'

'কি রকম?'

'ওয়ালী আহমেদ এই ক'দিন ধরে জোচ্চুরি করছে তোমার সঙ্গে। আমি জানি ওর রহস্য। ওকে প্যাঁচে ফেলে সব টাকা বোধহয় আদায় করা যায়। একটু শাস্তিও হয় ওর। আজ বিকেলে আবার যদি খেলতে বসো ওর সঙ্গে, তাহলে বাকি ব্যবস্থা আমি করতে পারি। তখন আমার টাকা ফেরত দিয়ে দিয়ো।'

'কিন্তু ও চুরি করবে কি করে? আমারও যে সন্দেহ হয়নি তা নয়। কিন্তু সব রকম সম্ভাবনাই ভেবে দেখেছি আমি। কার্ড বাঁটায় কোনও চালাকি নেই, কার্ডে কোন চিহ্ন নেই। যতবার ইচ্ছে কার্ড বদল করেছি আমি, আমার নিজের কেনা নতুন

প্যাকেটে খেলেছি। আশেপাশে কোনও আয়না নেই। টেবিলের ওপর যে চক্‌চকে সিগারেট কেস রেখে তাস বাঁটবার সময় তার সাহায্যে আমার কার্ডগুলো দেখে নেবে—তাও না। তবু কি করে যেন টের পায় ও আমার হাতে কি আছে। ব্লাফ খেলে দেখেছি, ব্লাইণ্ড খেলে দেখেছি, কিছুতেই কিছু হয় না। লোকটা বোধহয় জাদুকর।'

'লোকটা কচু! চোর একটা। আজকে খেলেই দেখো না কেমন বারোটা বাজিয়ে দিই শালার। একটু শিক্ষা না দিলে কত লোকের যে সর্বনাশ করবে তার ঠিক নেই।'

'যদি আজও হারি?'

'তাহলে তোমার আব্বাজীকে বোলো আমাকে দিয়েছ টাকা।'

'কিন্তু আমি যে আর খেলব না ঠিক করেছি।'

'তাহলে আর আমার টাকাটা শোধ করবার কোন উপায়ই থাকল না, জিনাত। ঠিক আমার টাকাগুলোই ফেরত নিতে পারি আমি—তোমার বাবার টাকা নয়।'

'আচ্ছা, বেশ। আজ না হয় খেলব কিছুক্ষণ। কিন্তু কতক্ষণ খেলতে হবে? আব্বাজীর কাছে শুনলাম তিনদিন পরই চলে যাচ্ছ তুমি করাচি থেকে। তোমাকে এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করতে পারব না আমি এই ক'দিন। তুমি থাকবে তো সাথে?'

'না, জিনাত। আমি থাকব না তোমার সাথে। অবশ্য আধঘন্টার বেশি খেলতে হবে না তোমাকে। রাজি?'

'নিম-রাজি। বিকেলটা নষ্ট করে দেবে আমার ওই শয়তানটা। এর চাইতে টাকাগুলো যাওয়াও ভাল ছিল। কাছে পেলেই এমন সব কথা আরম্ভ করবে…'

'আরেকটা কথা, জিনাত। আমার মনে হচ্ছে ওয়ালী আহমেদের জোচ্চুরির রহস্য আমি ভেদ করতে পেরেছি। আমার অনুমান মিথ্যেও হতে পারে। কিন্তু খেলতে খেলতে যদি দেখো ওয়ালী আহমেদ একটু অস্বাভাবিক ব্যবহার করছে, আশ্চর্য হয়ো না। চুপচাপ দেখে যেয়ো। বুঝলে?'

'জো হুকুম, হুজুর।'

কাছে সরে এসে রানার গা ঘেঁষে বসল জিনাত। ওর কাঁধে একটা হাত রাখল রানা।

'বিকেলে কোথায় যাওয়া যায় বলো তো, জিনা?'

'ক্লিফটন বীচ।'

'বেশ। তাই হবে।'

ট্যাক্সি এসে থামল বীচ লাগজারি হোটেলের সামনে।

ছয়

সাড়ে চারটে বাজে। জিনাত তৈরি হয়ে নিয়েছে। 'টা-টা' করে চলে গেল সে সেইলরস্ ক্লাবের উদ্দেশে।

মিনিট পনেরো পর ব্যালকনিতে এসে দেখল রানা নিচে, নির্দিষ্ট আসনে বসে আছে ওয়ালী আহমেদ আর জিনাত সুলতানা। আজ কেন জানি কিছুতেই মানাচ্ছে না জিনাতকে ওই পরিবেশের সঙ্গে। কী অদ্ভুত পরিবর্তন। তাড়াতাড়ি মুক্তি দিতে হবে ওকে এই অবস্থা থেকে।

শখের নিকন-এফ ক্যামেরায় লেন্স হুডটা লাগিয়ে ঝুলিয়ে নিল রানা গলায়। ব্রাউন হবি ই. এল. ৩০০ ইলেকট্রনিক ফ্ল্যাশ গানের ফ্ল্যাশ হেডটা লাগিয়ে নিল ক্যামেরার উপর। ও-মার্কা কন্ট্যাক্ট পয়েন্টে ঢুকিয়ে দিল কেবলটা। এবার অ্যাপার্চার এফ-১১ দিয়ে ডিস্ট্যান্স সেট করল বারো ফুটে, এক্সপোজার ওয়ান হানড্রেড।

তারপর সুটকেসের মধ্যে থেকে মোটা 'সঞ্চয়িতা' বই বের করল। তার ভেতর থেকে বেরোলো একখানা নাইন মিলিমিটার ক্যালিবারের হ্যামারলেস অটোমেটিক ল্যগার পিস্তল। দ্রুত একবার পরীক্ষা করে নিয়ে কোটের পকেটে ফেলল রানা সেটাকে। একটা এক্সট্রা ম্যাগাজিনও নিল সঙ্গে। তারপর বেরিয়ে এল বাইরে।

ঘরে চাবি লাগাতে গিয়ে কি মনে করে থেমে একটা কাগজের টুকরোকে কয়েক ভাঁজ করল রানা। দরজার কজার কাছে টুকরোটা রেখে বন্ধ করল দরজা। বাইরে থেকে আর দেখা যাচ্ছে না কাগজের টুকরো। একবার পরীক্ষা করে দেখল সে, দরজা খুললেই টুপ করে পড়ে যাচ্ছে সেটা মাটিতে। ওর অনুপস্থিতিতে কেউ ঘরে ঢুকলে টের পাবে ও কাগজের টুকরোটা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে।

ঘরে চাবি লাগিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল রানা দোতলায়। সোজা এসে দাঁড়াল একত্রিশ নম্বর কামরার সামনে। আগেই চাবি জোগাড় করেছে বেয়ারাকে ঘুষ দিয়ে। চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে খুলে ফেলল দরজা।

প্রথম ঘরটা বসবার ঘর। রানা যা ভেবেছিল তাই, খালি। পাশেই শোবার ঘর। তার ওপাশে ব্যালকনি। শোবার ঘরের দরজা বন্ধ দেখে একটু হতাশ হলো রানা। কিন্তু দেখল, ছিটকিনি লাগানো নেই তাতে। আস্তে চাপ দিতেই ফাঁক হয়ে গেল খানিকটা। প্রথমেই চাপা একটা কণ্ঠস্বর কানে এল, 'থ্রী অভ ডায়মণ্ড, টু অভ ক্লাবস্, ফোর অভ হার্টস।' নারীকণ্ঠ।

মৃদু হাসল রানা। বেচারী জিনাত ব্লাইণ্ড খেলে না থাকলে খালি বোর্ড ফী-টা পাবে এবার। পা টিপে ঢুকে পড়ল রানা ঘরের ভেতর। একটা উঁচু চেয়ারে বসে আছে একটি অ্যাংলো মেয়ে।

টেবিলের উপর মেয়েটির চোখ থেকে ইঞ্চি তিনেক দূরেই হচডহট্ট কোম্পানীর একটা শক্তিশালী দূরবীন। ট্রাইপডের উপর বসানো। দূরবীনের পাশেই রাখা একখানা ছোট মাইক্রোফোন থেকে তার গেছে টেবিলের একপাশে বসানো একটা বাক্সের মধ্যে। বাক্সের ভিতর থেকে আবার তার বেরিয়ে ঘরের ভেতর টাঙানো একটা ইনডোর এরিয়েলে গিয়ে মিশেছে।

আবার একটু সামনের দিকে ঝুঁকে দূরবীনে চোখ রেখে মেয়েটি একঘেয়ে কণ্ঠে গড়গড় করে বলে গেল, 'কুইন অভ ক্লাবস, জ্যাক অভ স্পেডস্, ফাইভ অভ ডায়মণ্ড।' বলেই মাইক্রোফোনের সুইচ অফ করে দিল।

এইটুকু সময়ের মধ্যে পা-টিপে এগিয়ে এল রানা। ক্যামেরাটা তুলল দু'হাতে মাথার ওপর। আন্দাজে যখন বুঝল দূরবীন, মাইক্রোফোন, এরিয়েল, মেয়েটির

চেহারার একাংশ আর দূরে জিনাত ও ওয়ালী আহমেদের টেবিল, সবই এক সাথে ধরা পড়েছে স্ক্রীনে—টিপে দিল শাটার।

ঝলসে উঠল ঘরটা তীব্র আলোয়। একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল মেয়েটির মুখ থেকে ঘটনার আকস্মিকতায়। চট্ করে ঘুরল সে রানার দিকে। নেমে পড়ল উঁচু চেয়ার থেকে।

'কে? কে তুমি?'

'ভয় পেয়ো না, সুন্দরী, আমি ভূত নই। আমার যা প্রয়োজন ছিল পেয়ে গেছি। তোমার কোনই ক্ষতি করব না আমি। আমার নাম মাসুদ রানা।'

মেয়েটিকে রীতিমত সুন্দরী বলতে হবে। লম্বা একহারা চেহারা, চমৎকার স্বাস্থ্য। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। বব ছাঁটা চুল বিছিয়ে পড়েছে কাঁধের ওপর। চোখে একরাশ কৌতূহল।

'কি করবে তুমি ছবি নিয়ে?'

'বলছি তো, তোমার কোন ক্ষতি করব না। অত ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? ওয়ালী আহমেদকে গোটা দুই গাঁট্টা মেরেই কেটে পড়ব। এইখানটায় দাঁড়িয়ে থাকো চুপচাপ—কোনও রকম চালাকির চেষ্টা করলে স্রেফ খুন করে ফেলব।'

ক্যামেরাটা নামিয়ে রাখল রানা টেবিলের ওপর। ডান হাতে পিস্তলটা ধরে উঠে বসল মেয়েটির চেয়ারে। চোখ রাখল দূরবীনে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে জিনাতের হাতের কার্ড। দুইয়ের পেয়ার পেয়েছে এবার সে। ওয়ালী আহমেদকে খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠবার সময় দিল রানা।

'এত টাকা ওয়ালী আহমেদের, তাও এইসব করে কেন?' জিজ্ঞেস করল সে মেয়েটিকে।

'ওই মেয়েটিকে ও চায়। একটু অনুগ্রহ করলেই টাকা ফিরিয়ে দেবে সব।'

'এই কি ওর প্রথম শিকার?'

'না। এর আগে আরও অনেক এসেছে। সবাই আত্মসমর্পণ করেছে।'

'তোমার মত রূপসী পেয়েও তৃপ্তি হয় না ওর?'

হাসল মেয়েটি।

'আমি বেতনভোগী চাকর মাত্র! নিত্য নতুন মেয়েমানুষ পছন্দ ওর। আমি প্রথম দিনেই পুরানো হয়ে গেছি।'

'তা, তুমি এগুলো করো কেন? ভাগ্যিস আমি আই. বি. কিংবা পুলিসের লোক নই। মেয়েটির একজন শুভাকাঙ্ক্ষী মাত্র। নইলে আজ এই ফটোর জোরে ওয়ালী আহমেদের সাথে সাথে তোমারও হাতে হাতকড়া পড়ত, তা জানো?'

'জানি। আমি এসব করি টাকার জন্যে। পাঁচ হাজার টাকা পাই মাসে। কিন্তু তুমি পুলিস হলে কি আর হত? টাকার কুমীর ও। টাকা দিয়ে কিনে নিত তোমাকে। আমাকেও মোটা টাকা মাইনে দেয় বলেই আছি। নইলে কার ভাল লাগে সকাল বিকেল বসে বসে একঘেয়ে অ্যানাউন্সমেন্ট করতে? এখন ভাবছি, চাকরিটা বুঝি গেল আমার। আর রাখবে না আমাকে।'

আর একবার চোখ রাখল রানা টেলিস্কোপে। আধ ইঞ্চি উঠিয়ে ওয়ালী আহমেদের বসন্তের দাগ ভর্তি মুখের উপর সেট্ করে নিল টেলিস্কোপ। দেখল প্রশান্ত

মুখটা এবার সত্যিই একটু উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। একটা পান মুখে ফেলে দরজার চতুষ্কোণ অন্ধকারের দিকে চাইল সে একবার।

'তোমার অ্যানাউন্সমেন্ট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বেশ ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ওয়ালী আহমেদ। এখন কি খেলা ছেড়ে উঠে পড়বে নাকি?'

'না। মাঝে মাঝে এরকম হয় কোনও তার-টার ছুটে গেলে। ও ভাবছে, আমি এখন সেই তার জোড়া লাগানোয় ব্যস্ত আছি।'

'তোমার নামটা কি বললে না?'

'অ্যানিটা গিলবার্ট।'

'অনীতা?'

'তা বলতে পারো। চার পুরুষ ধরে খ্রিস্টান। তাই উচ্চারণটা বেঁকে অ্যানিটা হয়ে গেছে। তোমার নাম কি যেন বললে, মাসুদ রানা, না?'

'হ্যাঁ।'

'আমি পাশের ঘর থেকে একটু ঘুরে আসতে পারি? আমাকে...'

'উঁহুঁ!' মাথা নাড়ল রানা। মেয়েটার আর কোনও মতলব আছে কিনা কে জানে। বলল, 'বেশ তো চমৎকার লাগছে তোমাকে দেখতে। আমার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এক পা-ও নড়তে পারবে না তুমি। ইচ্ছে করলে সিগারেট খেতে পারো একটা।'

কাঠগড়ার আসামীর মত দাঁড়িয়ে রইল অনীতা। একটা সিগারেট নিয়ে ধরাল। ভয়ে ভয়ে চাইল পিস্তলটার দিকে। রানা আবার চোখ রাখল দূরবীনে। ভ্রূকুটি দেখা দিয়েছে ওয়ালী আহমেদের কপালে। হিয়ারিং এইডের অ্যাম্পলিফায়ারটা অ্যাডজাস্ট করে এয়ার-ফোনটা ভাল করে গুঁজে দিল কানের মধ্যে—তাও কোন সিগনাল নেই। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে ভাবল রানা। ব্যাপারটা আরেকটু জমে উঠুক।

'বেশ সুন্দর ছোট্ট যন্ত্র আবিষ্কার করেছ। কত ওয়েভলেংথে ট্রান্সমিট করছ?'

'টু হাণ্ড্রেড টেন মেগাসাইকল্স্।'

মাইক্রোফোনটা হাতে তুলল রানা এবার। অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠল অনীতা ভয়ে পাংও হয়ে গেছে ওর মুখ।

'ভয়ঙ্কর লোক ওয়ালী আহমেদ। ওকে না ঘাঁটালে কি চলে না?'

'না।' দৃঢ় রানার কণ্ঠস্বর।

হঠাৎ এগিয়ে এসে রানার হাত ধরল মেয়েটা। বিস্ফারিত নয়নে চাইল রানার চোখের দিকে। বলল, 'আমার ওপর একটু কৃপা করো, মিস্টার রানা। ওকে ছেড়ে দাও। দয়া করে ছেড়ে দাও ওকে। নইলে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে আমাকে ওয়ালী আহমেদ। তুমি জানো না। ও পারে না এমন কাজ নেই।' আরেকটু কাছে সরে এল মেয়েটা। চোখে তার করুণ আকুতি। 'প্লীজ! রানা, সব কথা তোমাকে বলা যাবে না। ওকে যদি কিছু করো তাহলে ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে আমার। দোহাই তোমার, ছেড়ে দাও ওকে। বিনিময়ে যা চাইবে তাই দিতে রাজি আছি আমি।'

মৃদু হেসে রানা বলল, 'তা হয় না, অনীতা। তুমি খামোকা অত ভয় পাচ্ছ ওয়ালী আহমেদকে। ওর কিছুটা শিক্ষা হওয়া দরকার। আজ ও বড়লোক একটা

মেয়েকে ঠকাচ্ছে, কাল হয়তো এমন কাউকে ঠকাবে, যার পক্ষে সহ্য করা কঠিন। কাজেই ওর ইসক্রুপে সামান্য টাইট দিতেই হবে।'

মাইকের সুইচ টিপে দিল রানা। খুট্ করে একটা শব্দ হয়তো পৌঁছল ওয়ালী আহমেদের কানে। কপালের ভ্রূকুটি সোজা হয়ে গেল। প্রসন্ন হয়ে উঠল ওর মুখ। লালচে গোঁফে একবার তা দিয়ে নিয়ে পান ফেলল মুখে একটা।

রানা বলল, 'এইস্ অভ ডায়মণ্ড, এইস্ অভ হার্টস, এইস্ অভ স্পেড্‌স্। টপ্ ট্রায়ো!'

ঠিক যেন পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে গেল ওয়ালী আহমেদ। একবিন্দু চাঞ্চল্য প্রকাশ পেল না ওর চেহারায়। এমন কি সবুজ চোখ তুলে তাকাল না পর্যন্ত এদিকে।

'ওয়ালী আহমেদ, আমি আপনার মাশুক নানা বলছি। নিশ্চয়ই চিনতে পারছেন? আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি, দূরবীন, মাইক্রোফোন, ইত্যাদি সবকিছুর ছবি তুলে নিয়েছি আমি। আমার কথামত কাজ করলে এ ছবি পুলিসের হাতে যাবে না। বুঝতে পারছেন? পারলে বাঁ হাতটা ওপরে তুলে লাল মাথাটা চুলকান একবার।'

মুখের ভাব পরিবর্তন হলো না। কিন্তু বাম হাতটা তুলে মাথাটা চুলকাল ওয়ালী আহমেদ একবার।

'চমৎকার! এবার হাতের তাস চিত্ করে ফেলে দিন টেবিলের ওপর। ভয় নেই, কেবল টাকার ওপর দিয়েই যাবে এবারের ঝাপ্টা। হাতকড়া পড়বে না হাতে।'

নিতান্ত ভাল মানুষের মত হাতের তাস তিনটে ফেলে দিল ওয়ালী আহমেদ টেবিলের ওপর। ব্যালকনির খোলা দরজার দিকে চাইল সে একবার। মনে হলো সবুজ দৃষ্টিটা যেন দূরবীনের মধ্যে দিয়ে এসে চোখের ভেতর দিয়ে ঢুকে রানার খুলি ভেদ করে বেরিয়ে গেল।

'এবার পকেট থেকে চেক বইটা বের করুন দয়া করে। হ্যাঁ। একলক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকার চেক লিখুন একটা। মেয়েটির কাছ থেকে চুরি করেছেন মোট একলক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার। বাকি দশ হাজার ফাইন করলাম এই চুরির জন্যে। আজকের ডেট দিন—এক্ষুণি ক্যাশ করতে হবে এই হোটেলের ব্যাঙ্কে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের চেক বই-ই তো দেখা যাচ্ছে। বেশ, বেশ।...চেক্টা ধরুন, অঙ্কটা দেখব।...বাঃ, সব ঠিক আছে। এখন সই করুন। সই করবার সময় ফটোগ্রাফটার কথা একবার স্মরণ করুন। এবার উল্টো দিকে আরেকটা কাউন্টার-সাইন, ব্যস।'

চেক্টা ছিঁড়ে উল্টো পিঠে কাউন্টার-সাইন করল ওয়ালী আহমেদ। চেক বইয়ের কাউন্টার-ফয়েলে টুকে রাখল অঙ্কটা।

'এবার আরেকবার দেখি তো চেকের এপিঠ-ওপিঠ? এই তো, গুড! এখন একটা বেয়ারা ডেকে চেকটা ক্যাশ করে আনতে বলুন। আর দু'বোতল ফান্টার অর্ডার দিন। বিলটা আমিই দেব।'

অবাক বিস্ময়ে ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধা মিশ্রিত দৃষ্টিতে রানার দিকে চেয়ে রয়েছে অনীতা। রানা ওর দিকে চাইতেই ঢোক গিলল।

বেয়ারা এল, চেক নিয়ে চলে গেল। আরেকজন দু'বোতল স্ট্র লাগানো ফান্টা এনে রাখল টেবিলের উপর। কোল্ড ড্রিঙ্ক শেষ করে একটা পান মুখে ফেলল ওয়ালী আহ... ...কটা স্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছে ওর চোখে মুখে—যাক, শুধু টাকার উপর

দিয়েই কেটে গেল ফাঁড়াটা। স্বয়ং ব্যাঙ্কের ম্যানেজারই এল টাকা নিয়ে। সসম্ভ্রমে ওয়ালী আহমেদের হাতে দিয়ে চলে গেল।

'একটা নোটও যেন ভুল করে আবার পকেটে চলে না যায়! সব টাকা ভদ্রমহিলার হাতে দিয়ে জোচ্চুরি করার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। বাঃ, এই তো, লক্ষ্মী ছেলে! এবার আমি নেমে আসছি। কোন রকম চালাকির চেষ্টা করলে বিপদে পড়বেন। ব্যস। আজকের প্রথম অধিবেশনের এইখানেই সমাপ্তি। খোদা হাফেজ। পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ।'

সাত

ওয়ালী আহমেদের মুখের উপর এক দোয়াত কালি ছিটিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল ওরা বাইরে। তখন বিকেল সাড়ে-পাঁচটা। লোকজন জমতে আরম্ভ করেছে ক্লাবে। অনেকেই আড়চোখে চাইল। সকালের সেই ট্যাক্সি ড্রাইভার ওদের দেখে ডাকার অপেক্ষা না রেখেই সাঁ করে এসে দাঁড়াল। দরজা খুলে দিয়ে সালাম ঠুকল। ভাল বকশিশের এমনি গুণ! তাছাড়া রসিক ড্রাইভার রানা-জিনাতের আনন্দোচ্ছল কথোপকথনে হয়তো প্রচুর রসের সন্ধানও পেয়েছিল।

'ওয়ালী আহমেদকে আমি মস্ত বড় জাদুকর মনে করেছিলাম,' বলল জিনাত। 'এখন দেখছি তুমি তার ওপর দিয়েও এক কাঠি। ব্যাপারটা কি হলো বলো তো? হঠাৎ সব টাকা ফেরত দিয়ে মাফ চাইল কেন ও? কি জাদু করেছিলে তুমি?'

সবটা ব্যাপার ভেঙে বলতেই হেসে গড়িয়ে পড়ল জিনাত। ড্রাইভারও হাসতে আরম্ভ করল। ব্যাটা সব কথা শুনছে এবং তার থেকে রস আহরণ করছে, দেখে ওর দিকে চোখের ইশারা করে আরেক দফা হাসল জিনাত।

'আর প্যারি না, বাপু। হাসতে হাসতে খিল ধরে গেছে পেটে।'

রানা এ হাসিতে যোগ দিতে পারল না। লক্ষ করল সে, সবুজ রঙের একটা ফোক্সওয়াগেন আসছে ওদের পিছু পিছু ভদ্র দূরত্ব বজায় রেখে। অনেকক্ষণ ধরেই পিছু নিয়েছে।

ক্লিফটন বীচে বিকেল বেলা অনেক লোকের ভিড়। বাগানের ভেতর পিঁপড়ের মত পিল পিল করে বেড়াচ্ছে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। সাগরের ধারে বসে কফি খেলো ওরা, সূর্যাস্ত দেখল। ভবিষ্যতের গল্পে এমন মশগুল হয়ে গেল যে খেয়ালই করল না বিকেল গড়িয়ে গেছে, গোধূলির শেষ রঙও কালচে হয়ে আসছে মেঘের গায়ে। আসন্ন রাত্রির কালো ছায়া পড়েছে জনশূন্য সাগরের তীরে। গা-টা ছম্ ছম্ করে উঠল জিনাতের।

'চলো, উঠে পড়ি, রানা। সব লোক চলে গেছে। খেয়ালই করিনি এতক্ষণ।'

অনেকগুলো ধাপ ডিঙিয়ে উঠে এল ওরা উপরে। অবাক হয়ে দেখল খাঁ-খাঁ করছে জনশূন্য বাগানগুলো। ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেছে এত লোক সবাই। সবাই চলে গেছে অন্ধকার লাগার আগে আগেই। এতক্ষণে রানার মনে পড়ল ওর এক বন্ধু উপদেশ দিয়েছিল—ক্লিফটন বীচে যদি যাও, আর বিপদ কুড়োবার ইচ্ছে যদি

না থাকে, তবে লক্ষ্মী ছেলের মত ফিরে এসো পাঁচটা বাজতেই।

রাস্তায় পৌঁছে দেখল রানা বেশ কিছুটা দূরে সেই সবুজ ফোক্সওয়াগেন দাঁড়িয়ে আছে। বাম দিকের মাডগার্ডের ওপর লম্বা এরিয়েল।

ট্যাক্সি দাঁড়িয়েই রয়েছে। কিন্তু ড্রাইভারটা পিছনের সীটে পা ভাঁজ করে শুয়ে ঘুমাচ্ছে অকাতরে। অনেক ডাকাডাকি করেও ওঠানো গেল না ওকে। হর্ন বাজতেই ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বলল, 'আরে ও মুন্নির মা, বাচ্চা কাঁদছে শুনতে পাও না? উঠে মুতের কাঁথা বদলে দাও।' বলেই আবার গুটি সুটি মেরে শুয়ে নাক ডাকাতে আরম্ভ করল। মৃদু হাসল রানা। এমন ঘুমও হয় মানুষের! চুলের মুঠি ধরে গোটা দুই শক্ত ঝাঁকি দিতেই উঠে বসল ড্রাইভার। একটু লজ্জিত হয়ে বলল, 'ঘুমাইনি, স্যার। এই একটু গড়িয়ে নিচ্ছিলাম আর কি।'

মাইল চারেক যাওয়ার পরই ঘটল ঘটনাটা।

হঠাৎ অবাক হয়ে দেখল ওরা সামনে রাস্তার ওপর জ্বলে উঠল ছ'টা হেড লাইট। আলোগুলোর দূরত্ব দেখে আন্দাজ করল রানা, ট্রাক হবে। সমস্ত রাস্তা জুড়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল তিনটে ট্রাক হেড লাইট নিভিয়ে দিয়ে। ট্যাক্সিটা কাছে আসতেই হেড লাইট জ্বালিয়ে এগোতে আরম্ভ করল ওদের দিকে।

ব্যাপার কি! অ্যাক্সিডেন্ট করবে নাকি?

মুহূর্তে রানার দেহের পেশীগুলো সজাগ হয়ে উঠল। বিপদের গন্ধ পেল সে। জায়গা ছাড়বে না এই ট্রাক। ওদের পিষে মারবার জন্যে পাঠানো হয়েছে এগুলোকে। মনে পড়ল রানার, এই একটু আগেই রাস্তার পাশে এদিকে মুখ করা পরপর তিনটে ট্রাককে ছাড়িয়ে এসেছে ওরা। তখন কিছুই সন্দেহ করেনি। এখন বুঝল ওগুলো আসবে এবার পিছন থেকে রাস্তা জুড়ে। পালাবার পথ থাকবে না। রানার অনুমানের সত্যতা প্রমাণ করবার জন্যেই যেন পিছন থেকে একসাথে জ্বলে উঠল ছ'টা হেড লাইট। দুই হাতে তালি দিয়ে যেমন ভাবে মশা মারা হয়, তেমনি ভাবে হত্যা করা হবে ওদের। ফুল-স্পীডে এগিয়ে আসছে ট্রাকগুলো। আলোয় আলোময় হয়ে গেছে রাস্তা। পালাবার কোনও পথ নেই।

এখন উপায়? রাস্তার ডাইনে-বামে বিস্তীর্ণ অসমান অনুর্বর মাঠ। ট্রায়াম্প হেরাল্ডের পক্ষে ওই মাঠের ওপর দিয়ে ট্রাকের সাথে পাল্লা দেয়া সম্ভব নয়। সেখানেও ধাওয়া করে আসবে ওরা। আশেপাশে লোকালয়ের চিহ্নও নেই যে কোনও রকম সাহায্য পাবে।

'ব্রেক করো, ড্রাইভার। গাড়ি থামাও!' চিৎকার করে উঠল রানা।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে ড্রাইভার। এমন ব্যাপার জীবনে দেখেনি সে কখনও। রানার চিৎকারে সংবিৎ ফিরে পেল সে। বিপদ বুঝে প্রাণপণে ব্রেক করল। ছয় সাত গজ স্কিড করে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্যাক্সি।

এইটুকু সময়ের মধ্যে দ্রুত চিন্তা করে নিল রানা অবস্থাটা। হয় স্বর্ণমৃগ, নয় ওয়ালী আহমেদ। সোহেল জুয়াড়ী থেকে সাবধান হতে বলেছিল ওকে। ওয়ালী আহমেদের প্রতিশোধ হওয়াই বেশি স্বাভাবিক। কারণ হোটেল থেকেই পিছু নিয়েছে ওয়্যারলেস ফিট করা সবুজ ফোক্সওয়াগেন। টাকার জন্য পাঠায়নি সে এদের—কারণ ওয়ালী আহমেদ নিজের চোখেই ওদেরকে টাকাগুলো ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে জমা

দিতে দেখেছে। পাঠিয়েছে প্রতিশোধ নিতে। শিউরে উঠল রানা। কী ভয়ঙ্কর মৃত্যু! আর মাত্র গজ বিশেক আছে। দৈত্যের মত গর্জন করে এগিয়ে আসছে সাক্ষাৎ মৃত্যু। কাছে পিঠে সাক্ষী নেই কেউ। আগামী কাল সড়ক দুর্ঘটনার খবর বেরোবে পত্রিকায় মোটা হেডিং-এ। কে বুঝবে যে এটা খুন? নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিতে চায় ওয়ালী আহমেদ রানার ওপর—মেয়েটির ওপর নিশ্চয়ই নয়। এবং ট্যাক্সি ড্রাইভারের সঙ্গে শত্রুতার প্রশ্নই ওঠে না।

'লাফিয়ে পড়ো গাড়ি থেকে। দৌড় দাও ডান দিকে মাঠের মধ্যে দিয়ে।'

'আর তুমি?' রানাকে বেরোতে না দেখে জিজ্ঞেস করল জিনাত।

'যা বলছি তাই করো। জলদি!' ধমকে উঠল রানা।

জিনাত এবং ড্রাইভার গাড়ি থেকে বেরিয়েই ছুটল ডান ধারে।

এক ঝটকায় দরজা খুলে রানাও বেরিয়ে এল গাড়ি থেকে। আর মাত্র দশ গজ আছে। ডান ধারে গেলে চলবে না—তাহলে সবাই মারা পড়বে একসাথে। দুই লাফে রানা সরে গিয়ে দাঁড়াল বাম দিকের মাঠের ধারে।

প্রথমেই সামনে থেকে ধাক্কা মারল মাঝের ট্রাকটা ট্রায়াম্প হেরাল্ডের নাকের ওপর। পরমুহূর্তেই পিছন থেকে হুড়মুড় করে এসে পড়ল আরেকটা ট্রাক। প্রচণ্ড ধাতব শব্দ হলো। চুরমার হয়ে গেল ট্রায়াম্পের নরম দেহ। থেঁতলে চ্যাপ্টা হয়ে গেল লেটেস্ট মডেল ট্রায়াম্প হেরাল্ডের ছিমছাম চেহারা। গাড়ি বলে চিনবার উপায় রইল না। লোহার দামে বিকবে এখন ওটা। অন্যান্য ট্রাকগুলোও থেমে দাঁড়িয়েছে।

'উও দেখো, ময়দান পর খাড়া হুয়া হ্যায় শ্যায়তান।'

কথাটা কানে যেতেই আন্দাজের উপর গুলি ছুঁড়ল রানা দু'বার। একটা আর্তচিৎকার কানে এল। দ্বিতীয়টা বোধহয় লাগল না। কিন্তু গুলির ভয়ে দমে যাবার পাত্র ওরা নয়। একটা ট্রাক থেমে রইল রাস্তার ওপর। বাকিগুলো নেমে আসছে মাঠের মধ্যে।

আরও দুটো গুলি ছুঁড়ল রানা। অন্য গাড়ির হেড লাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল ড্রাইভিং হুইল ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল আরেকজন সীটের ওপর। অ্যাক্সিলারেটরের ওপর থেকে পা-টা বোধহয় সরেনি—মাঠের উপর দিয়ে কোনাকুনি চলে গেল ট্রাকটা ফার্স্ট গিয়ারে। এবারও দ্বিতীয় গুলিটা লাগল না।

দুটো গেল। কিন্তু বাকি চারটে এবার সোজা তেড়ে এল রানার দিকে। দৌড় দিল রানা মাঠের মধ্যে দিয়ে, কিন্তু হেড লাইটের আলোয় পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা রানাকে। কয়েকজন লোক মিলে খোলা মাঠের ওপর একটা ছুঁচোকে তাড়া করলে ছুঁচোর কেমন লাগে বুঝতে পারল রানা। কিচমিচ করাই সার, নিস্তার নেই কিছুতেই।

পাগলের মত গুলি করল রানা হেড লাইট অফ করার জন্যে। পাঁচটা গুলির পরই শেষ হয়ে গেল গুলি। দুটো ট্রাকের চোখ কানা করে দিয়েছে রানা। কিন্তু তাতে ফল হলো উল্টো। রানা আর দেখতে পাচ্ছে না ওদের। অথচ ওরা দেখতে পাচ্ছে রানাকে বাকি দুটো গাড়ির হেড লাইটের আলোয়। যে কোনও মুহূর্তে ঘাড়ে এসে পড়তে পারে। এঁকে বেঁকে ছুটতে থাকল রানা মাঠময়। দৌড়াতে দৌড়াতেই রিলিজ বাটন টিপে ফেলে দিল খালি ম্যাগাজিন। এক্সট্রা ম্যাগাজিনটা ভরে নিল পিস্তলে

আর মাত্র আটটা গুলি। কাজেই বাজে খরচ করা যাবে না। টায়ার পাংচার করবার চেষ্টা বৃথা—তাতে ঠেকানো যাবে না। স্লাইড টেনে চেম্বারে গুলি নিয়ে এল রানা।

আবার একটা ট্রাকের হেড লাইটের আলোয় ধরা পড়ল রানা। আলো না নেভাতে পারলে কোনও আশাই নেই। অদৃশ্য এক ট্রাকের গর্জন শোনা গেল পেছনে। দিশেহারার মত ছুটল সে। ছুটতে ছুটতে ট্রাকের শব্দ খুব কাছে এসে গেলে দিক পরিবর্তন করছে বিদ্যুৎগতিতে। আর গুলি ছুঁড়ছে সুযোগ পেলেই।

ছয়টা গুলির পর নিভে গেল সব হেড লাইট। এবার শুধু দেখা যাচ্ছে চারটে উন্মত্ত দানবের ছায়া মূর্তি। ডান দিক থেকে একটা ট্রাক ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছিল প্রায়। লাফিয়ে সরে দাঁড়াতেই বাম দিক থেকে এল আরেকটা। মাডগার্ডের প্রচণ্ড এক ধাক্কায় মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রানা মাটিতে। প্যান্টের কাপড় ছিঁড়ে দাঁত বসাল শক্ত মাটি হাঁটুর মাংসে। ছড়ে গেল শরীরের অনেক জায়গা—নোনতা ঘাম লেগে জ্বালা করে উঠল কাটা জায়গাগুলো। দরদর করে ঘাম ঝরছে সর্বাঙ্গ থেকে। নিঃশ্বাস পড়ছে হাপরের মত। উঠে বসবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু পারল না। সোজা এগিয়ে আসছে একটা বিকট ছায়ামূর্তি। উঠে পড়ো। উঠে পড়ো, গর্দভ! এত সহজেই হেরে যাবে? আপন মনে বলল রানা। তারপর এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। ট্রাকটাকে পাশ কাটিয়েই লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে ফুটবোর্ডের ওপর। ড্রাইভারের কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে ট্রিগার টিপল সে, তারপরই চমকে উঠে লাফিয়ে নেমে গেল ফুটবোর্ড থেকে সামনে আরেকটা ট্রাক দেখে। এদিকেই আসছিল ট্রাকটা দ্রুতগতিতে। প্রচণ্ড শব্দে ধাক্কা লাগল দুটোয়। ডিজনির কার্টুনে দুই খরগোস যেমন পিছনের পায়ে ভর করে সামনাসামনি দাঁড়ায়—তেমনি দেখতে লাগল ট্রাক দুটোকে। দুটোরই সামনেটা উঠে গেল আসমানের দিকে—তারপর খেলনার মত পড়ে গেল কাত হয়ে। ছুটে সরে যেতে আর একটু দেরি হলে রানার ওপরই পড়ত।

পিস্তলে আর গুলি আছে একটা। শত্রু আছে দুটো। এদিকে দুই ট্রাকের প্রচণ্ড সংঘর্ষের শব্দ শুনে দুটোই আসছে এদিকে। একটা উল্টানো ট্রাকের আড়ালে সরে দাঁড়াল রানা। কাছে আসতেই গুলি করল। শেষ গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। হঠাৎ একটা ট্রাক বিগড়ে গিয়ে খামোকা ঘুরতে থাকল মাঠের মধ্যে একই জায়গায়। বাকি ট্রাকটা তিন সেকেণ্ড থেমে থেকে বোধহয় হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করল ব্যাপারটা, তারপর হাঁ-হাঁ করে ছুটে গেল রাস্তার দিকে। রাস্তায় উঠেই সোজা পিঠটান দিল শহরের দিকে।

হাঁপাচ্ছে রানা। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে ওর মাটির ওপর। কপালের দুইপাশে দপ্ দপ্ করছে শিরাগুলো। কান দিয়ে গরম ভাপ ছুটছে। এতক্ষণের প্রাণান্তকর দৌড়ের ফলে মাথার চুল পর্যন্ত ভিজে গেছে ঘামে। উল্টানো ট্রাকের গায়ে হেলান দিয়ে জিরিয়ে নিল সে কিছুক্ষণ। গুলিহীন পিস্তলটা রেখে দিল কোটের পকেটে।

হঠাৎ মনে পড়ল জিনাতের কথা। তাড়াতাড়ি শহরে ফিরে রিপোর্ট করবার তাগিদও অনুভব করল সে। তিন পা এগিয়েই পিছনে একটু খস্ খস্ আওয়াজ পেয়ে ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল রানা। প্রথমেই চোখ পড়ল একটা উদ্যত ছুরির ওপর। ডান হাতে কব্জিটা ধরেই আছড়ে ফেলল সে লোকটাকে মাটির ওপর। বুড়িগঙ্গার শুঁটকি মাছের মত মাথাটা নিচের দিকে করে ডিগবাজি খেলো লোকটা। ছিটকে পড়ে গেল

ছুরি হাত থেকে। উঠে বসবার চেষ্টা করছিল, শিরদাঁড়ার ওপর রানার বুটের একটা কড়া লাথি খেয়ে বেঁকে গেল ওর শরীর। মুখে গোঁ-গোঁ আওয়াজ তুলেই লুটিয়ে পড়ল মাটিতে জ্ঞান হারিয়ে। এ সেই মাঠের মাঝখানে অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া ট্রাকের অপর ড্রাইভারটা।

রাস্তায় উঠে এল রানা।

'জিনা···!' চিৎকার করে ডাকল সে।

'আয়ি।' উত্তর এল দূর থেকে।

হেড লাইট জ্বালা ও স্টার্ট দেয়া অবস্থায় রাস্তার ওপর দাঁড়ানো ট্রাকের মধ্যে থেকে টেনে নামাল রানা দুর্ধর্ষ চেহারার এক পাঞ্জাবী ড্রাইভারের মৃতদেহ। ঠিক চোখের পাশে লেগেছিল গুলিটা। দরজা এবং সামনের উইণ্ড-স্ক্রীনে রক্তের সাথে লেগে আছে মগজের অংশ।

রাস্তায় উঠে এল জিনাত ও ট্যাক্সি ড্রাইভার। তোবড়ানো গাড়িটার দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ নিষ্ফল ক্ষোভ প্রকাশ করল ড্রাইভার, তারপর চূর্ণ বিচূর্ণ গাড়ির ড্যাশ বোর্ড থেকে ব্লু-বুক আর রোড পারমিটের টোকেনটা বের করে নিয়ে বলল, 'হামকো ক্যায়া হ্যায়, — ফাটেগা ইনশিওর ওয়ালোঁকো।'

উঠে বসল ড্রাইভার ট্রাকের ড্রাইভিং সীটে।

তখনও বন্-বন্ ঘুরছে একটা ট্রাক অন্ধকার মাঠের মধ্যে।

মাইল ছয়েক আসতেই পিছনে কর্কশ হর্ন শোনা গেল, 'বিপ···বি···প্।' অভ্যাসবশে সাইড দিল ড্রাইভার। পাশ দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল সবুজ ফোক্সওয়াগেন। এরিয়েলের রডটা দুলছে এদিক ওদিক। রানা বুঝল ওয়্যারলেস ফিট্ করা আছে ওই গাড়িতে। রানার গতিবিধি সম্পর্কে ট্রাক ড্রাইভারদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ওই গাড়ি থেকেই। ফোক্সওয়াগেনের ব্যাক লাইট যখন প্রায় অদৃশ্য হয়ে এল তখন হঠাৎ ট্রাকের মধ্যে কে যেন কথা বলে উঠল।

'মাসুদ রানা, হুঁশিয়ার! মওত বহোত দূর ন্যহিঁ!'

মাথার ওপর চেয়ে দেখল রানা। স্পীকার ঝুলছে একটা।

আট

খান মোহাম্মদ জানের ওখান থেকে কয়েক জায়গায় ফোন করল মাসুদ রানা। এক বিশেষ মহলে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। ব্যস্ত হয়ে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল একদল লোক এদিক-ওদিক।

না খাইয়ে ছাড়ল না জিনাত। খাওয়ার টেবিলেই পরিচয় হলো একজন সুদর্শন যুবকের সাথে। সাঈদ খান। মোহাম্মদ জানের ভাতিজা। রানার চেয়ে কিছু ছোট হবে বয়সে। মোহাম্মদ জানের পরে সে-ই হবে এই প্রতাপশালী ট্রাইবের সর্দার। সত্যিই, সর্দারের মতই চেহারা। চমৎকার স্বাস্থ্য। লম্বা একহারা পেটা শরীর। রানা নিজে মিশুক প্রকৃতির মানুষ না হলেও প্রথম দর্শনেই পছন্দ করল ছেলেটিকে। গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায় এ-লোকের ওপর।

কিন্তু রানা এটাও বুঝল যে প্রথম দর্শনেই তাকে অপছন্দ করেছে সাঈদ। কারণ কিছুটা আঁচ করল সে জিনাতের দিকে ওর চোরা চাহনি দেখে। বুঝল, মস্ত ক্ষত চেপে রেখেছে বেচারা সাঈদ। ভেতর ভেতর গুমরে মরছে সে কতদিন ধরে কে জানে। বোধহয় কাউকে, এমন কি জিনাতকেও, মুখ ফুটে বলতে পারেনি সে কিছু। চেষ্টা করেও ওর সাথে আলাপ জমাতে পারল না রানা। শেষে হাল ছেড়ে দিল মৃদু হেসে।

ট্রাক-হামলার সমস্ত ঘটনা আগাগোড়া মন দিয়ে শুনল মোহাম্মদ জান। কুঞ্চিত হয়ে উঠল ওর কপাল। বলল, 'বুঝতে পারছি, মস্ত শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে লেগেছ তুমি, রানা। এটা আমার মালাকান্দ নয়। হলে পিষে ফেলতে পারতাম যে-কোনও শত্রুকে। তুমি বরং এখানেই থেকে যাও রাত দশটা পর্যন্ত। এখান থেকেই বেরোনো যাবে তোমার স্বর্ণমৃগের সন্ধানে।'

'তা হয় না। আমার কিছু কাজ আছে হোটেলে। আপনি বরং ওখানেই আসুন।'

'বেশ। সাঈদ, তুমি মেজর রানার সঙ্গে গিয়ে চিনে আসো হোটেলটা।'

বেরোবার আগে রানাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল জিনাত। রানা কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ করেছে, খাওয়া দাওয়ার শেষে পানি খাওয়ার আগে সোহেলের দেয়া যষ্টিমধু চুবিয়ে নিল জিনাত গ্লাসের মধ্যে। অত্যন্ত সিরিয়াস সে এ-সব ব্যাপারে।

'আমার জন্যেই তোমার আজ এই বিপদ, রানা।'

'তোমার জন্যে মানে?'

'আমার জন্যেই তো। সাধুবাবা তোমাকে জুয়াড়ীর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে বলেছিল আমাকে। পোড়া মন! ভুলে গেলাম কি করে? আজ রাতে আমার ঘুম হবে না, রানা।'

'দূর। এসব চিন্তা করে মাথা গরম কোরো না, জিনাত। কাল না তোমার জন্মদিন? বাড়িতে বন্ধু-বান্ধব আসবে। খামোকা রাত জাগলে কাল দুপুর হলেই দাঁত কেলিয়ে পড়ে থাকবে—কেক কাটারও শক্তি থাকবে না আর বিকেল বেলা!'

হাসল জিনাত। রানার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'কাল আসছ তো?'

'আসছ তো, মানে? আজ রাতের কাজটা ভালোয় ভালোয় চুকে গেলে কাল তো আমাকে এখান থেকে নড়াতেই পারবে না!'

'কি উপহার দেবে, বলো না?' আব্দার ধরে জিনাত।

'যখন দেব, তখন দেখো! অবাক করে দেব একেবারে।'

সাঈদ জিজ্ঞেস করল, 'ওয়ালী আহমেদের সাথে লাগতে গেলেন কেন? শত্রুতা হলো কিসে?'

রানা ওর জোচ্চুরির কথা বলল সাঈদকে খুলে। কিভাবে শায়েস্তা করেছে আজ বিকেলে, বলল। ওয়ালী আহমেদের আসল মতলব শুনে কঠিন হয়ে গেল সাঈদের মুখ।

'তাহলে জিনাতকে নিয়েই লেগেছে আপনাদের মধ্যে?'

'অনেকটা তাই বলতে পারেন।'

'যদি তাই হয় তাহলে জিনাতের কপালটা নেহায়েতই খারাপ বলতে হবে। ওয়ালী আহমেদ যা চায় তা সে করে ছাড়ে। আপনি জানেন না, কিন্তু আমি চিনি ওকে। আজ পর্যন্ত কেউ ঠেকাতে পারেনি ওকে—আপনিও পারবেন না, আমিও না, চাচাজীও না। করাচি শহরে ওর ক্ষমতার কাছে আমরা কিচ্ছু না।'

'ওকে আপনি চিনলেন কিভাবে?'

'আমাদের একটা গোপন ব্যবসায়ে দুই-দুইবার মার খেয়েছি আমরা ওর হাতে। তাও আবার মলাকান্দে বসে। চাচাজী জানে না। আমার ওপর ছিল সে ব্যবসার ভার। অদ্ভুত ওর ক্ষমতা। আর করাচিতে তো দিন-দুপুরে যদি সে খোলা রাস্তার ওপর আপনাকে গুলি করে মারে, কিচ্ছু হবে না ওর। কেউ কিচ্ছু করতে পারবে না। পাত্তাই পাবে না।'

'আপনি দেখছি ভয় ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছেন আমার মনে।'

'আমি আপনাকে সত্য উপলব্ধি করাবার চেষ্টা করছি।'

'আমার মনে হয় না সাধারণ একজন লোককে এত ভয় পাওয়ার কিছু আছে।' আলোচনাটা ভাল লাগছে না রানার। গলার স্বরে সেটা টের পেল সাঈদ।

'সাধারণ লোক!' একটু হাসল সাঈদ। তারপর চুপ হয়ে গেল।

ছোট্ট লনটা পার হয়ে লাউঞ্জে উঠবার কয়েক ধাপ সিঁড়ি। হোটেলের বাইরে গাড়ি রেখে এগিয়ে আসছে সাঈদ আর রানা পাশাপাশি। রানার আপত্তি সত্ত্বেও ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দেবে বলে সাথে আসছে সাঈদ। হঠাৎ রানার প্রবল এক ধাক্কায় রাস্তা থেকে ছিটকে লনের ঘাসে চলে গেল সাঈদ। টাল সামলাতে না পেরে গোটা কয়েক ডালিয়া ফুলের গাছসহ ভূমিসাৎ হলো সে। রানাও লাফিয়ে সরে গিয়েছে রাস্তার অপর পাশে ঘাসের ওপর। এমনি সময়ে দড়াম করে পড়ল পাথরটা রাস্তার ওপর। প্রায় তিন মণ ওজনের প্রকাণ্ড একখানা পাথর নীচের রাস্তাটা আধহাত ডাবিয়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে লাগল লোহার গেটে। দুমড়ে বেঁকে গেল গেট। কয়েকটা শিক খুলে বেরিয়ে গেল নিচের খোপ থেকে। সাত তলার ছাদ থেকে পড়েছে পাথর।

চোখের নিমেষে ঘটে গেল ব্যাপারটা। উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে এল সাঈদ রানার দিকে।

'চোট তো ন্যই লাগি, মেজর?'

কোনও উত্তর না দিয়ে ওর হাত ধরে দ্রুত উঠে এল রানা লাউঞ্জে। এটা যে সাধারণ দুর্ঘটনা নয়, কেউ ওদের খুন করবার জন্যে কাজটা করেছে, বুঝতে পেরেই এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ছুটল সাঈদ ছাদের দিকে। এক এক লাফে তিন সিঁড়ি টপকাচ্ছে সে। ঠাণ্ডা মাথায় লিফটে করে পাঁচতলায় উঠে এল রানা। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করতেই দেখল সাঈদ আসছে সিঁড়ি বেয়ে। হাতে রিভলভার। দ্রুত চিন্তা করছে রানা।

'ছাতে গিয়ে কোনও লাভ নেই, মি. সাঈদ। এই দেখুন।'

দেখা গেল বাম পাশের লিফটটা নিচে নেমে আসছে। রানা বোতাম টিপল বার কয়েক। 6...5...4...3 নেমে যাচ্ছে লিফট—থামল না। হলুদ নম্বরগুলো কমে আসছে। 2...1...G, সোজা নেমে গেল লিফট গ্রাউণ্ড ফ্লোরে।

'আপনি ওপরে না এসে নিচে থাকলেই ধরা যেত ওদের,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সাঈদ।

'আমার যতদূর বিশ্বাস, ওই লিফটে অপারেটার ছাড়া আর কেউ-ই নেই।'

'কি করে বুঝলেন?'

'এইটাই স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে।'

'তাহলে ছাতের ওপর নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে দুশমনদের,' আবার রওনা হচ্ছিল সাঈদ, এক থাবা বসাল রানা ওর কাঁধে।

'ছাতেও কিছু পাবেন না, মিস্টার সাঈদ। দুশমন যে-ই হোক না কেন, আমার-আপনার চেয়ে অনেক হুঁশিয়ার। যদি দেখতে চান তাহলে আসুন আমার সঙ্গে।'

সাঈদের উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল রানা। দেখল কাগজের টুকরোটা পড়ে আছে ম্যাটিতে। অর্থাৎ, নিশ্চয়ই কেউ ঘরে ঢুকেছিল—কিংবা এখনও আছে।

'রিভলভারটা দিন তো। আমার পিস্তলের গুলি শেষ।'

অবাক হয়ে রানার মুখের দিকে চেয়ে এগিয়ে দিল সাঈদ ওর রিভলভার। নিঃশব্দে তালা খুলে ডান হাতে রিভলভারটা নিল রানা। তারপর বাঁ হাতের এক ধাক্কায় কপাট খুলেই লাফিয়ে ঢুকল ঘরের মধ্যে। না। ঘরের মধ্যে কেউ নেই। শূন্য ঘরটা যেন উপহাস করল রানার অতি-সতর্কতাকে। তবু বাতি জ্বালিয়ে দুটো ঘর আর বাথরুমটা দেখে নিয়ে নিঃসন্দেহ হলো রানা। তারপর বাতি নিভিয়ে দিয়ে সাঈদকে নিয়ে এসে দাঁড়াল ব্যালকনিতে।

'ওই যে!' সাঈদেরই চোখে পড়ল আগে। রানাও চাইল ওইদিকে। দেখল, রশি বেয়ে নেমে যাচ্ছে একজন লোক ছাত থেকে হোটেলের পেছনে। আবছা অন্ধকারে চেহারা বোঝা যাচ্ছে না। মাটিতে পা ঠেকতেই দৌড় দিল লোকটা সাগরের দিকে। সেইলরস্ ক্লাবের কাছে গিয়ে রাস্তায় উঠতেই ল্যাম্প পোস্টের আলোয় লোকটার চেহারা দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠল রানা এবং সাঈদ। মানুষের চেহারা যে এত প্রকাণ্ড আর এত সৃষ্টিছাড়া কুৎসিত হতে পারে, ধারণা ছিল না রানার। মিশমিশে কালো, প্রায় সাড়ে সাত ফুট লম্বা, তেমনি চওড়া। একবার পেছন ফিরে দেখল কেউ আসছে কি না। দেখা গেল ওপরের ঠোঁট নেই। বিকট কালো মুখে ঝক্‌ঝক্ করছে হিংস্র সাদা দাঁত। বুলেটের বেগে চলে গেল বীভৎস মূর্তিটা সমুদ্রের দিকে।

'গুংগা!' কেঁপে উঠল সাঈদের কণ্ঠস্বর।

'চেনেন আপনি ওকে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ, চিনি। ওয়ালী আহমেদের দেহরক্ষী। লোকটা কালা এবং বোবা। ভয়ঙ্কর শক্তি ওর গায়ে।'

'তা চেহারা দেখেই মনে হলো। ওই তিন-মনি পাথর তাহলে ও-ই ফেলেছিল।'

'ওই পাথর ওর কাছে দশ ইঞ্চি ইঁটের মত হাল্কা। আপনি বড় ভয়ঙ্কর পাল্লায় পড়েছেন, মিস্টার মাসুদ রানা। আমি পরামর্শ দিচ্ছি, সম্ভব হলে আজই পালিয়ে যান আপনি করাচি ছেড়ে।'

এসব কথা শুনছে না রানা। ওর মনে পড়ল, ঢাকায় হেড অফিসে চীফ

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কর্নেল শেখের একটা কথা। পি. সি. আই.-এর একজনকে দিন দুপুরে খুন করা হয়েছিল ম্যাকলিওড্ রোডে। ছাতের ওপর থেকে মস্ত একটা পাথর ফেলে কেউ খেঁতলে মেরেছিল ওকে ফুটপাথের ওপর। আজকের ঘটনার সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। পি. সি. আই. এজেন্টকে মারা হয়েছিল স্বর্ণমৃগের পেছনে লাগার জন্যে, আর রানাকে খুন করবার চেষ্টা করা হলো ওয়ালী আহমেদের পেছনে লাগার জন্যে। দুই জায়গাতেই একই অস্ত্র—পাথর।

তাহলে? ওয়ালী আহমেদই কি স্বর্ণমৃগ? না এটা একটা দৈব-সংযোগ—কোইন্‌সিডেন্স? এমনও হতে পারে যে ওয়ালী আহমেদের সাথে ঝগড়াও হলো, আর স্বর্ণমৃগের কাছে ধরাও পড়ল একই সঙ্গে। স্বর্ণমৃগই আসলে আক্রমণ চালাচ্ছে, আর রানা খামোকা ওয়ালী আহমেদের সঙ্গে ঘটনাকে জড়িয়ে নিয়ে সব মিলিয়ে জগা-খিচুড়ি পাকাচ্ছে।

কিন্তু তাহলে গুংগা? সাঈদের কথা কতখানি নির্ভরযোগ্য?

'আপনি ঠিক জানেন যে ওই বিকট চেহারার লোকটা গুংগা? ওয়ালী আহমেদের দেহরক্ষী? চোখের ভুলও তো হতে পারে?'

'পাগল নাকি? যে একবার সামনে থেকে দেখেছে ওই চেহারা, জীবনে তার এ ব্যাপারে অন্তত চোখের ভুল হবে না। আপনিই বলুন, আপনি তো এক মুহূর্তের জন্যে দেখেছেন, ভুলতে পারবেন ওই চেহারা?'

কথাটা মনে মনে স্বীকার করতেই হলো রানাকে। ও চেহারা ভুলবার নয়। কয়েক রাতের ঘুম নষ্ট করে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। তাহলে? অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠল যে ব্যাপারটা। ওয়ালী আহমেদই যদি স্বর্ণমৃগ হয়ে থাকে তাহলে সে কি জেনে ফেলেছে রানার পরিচয়? নাকি পৌরুষে আঘাত লাগায় কেবল প্রতিশোধ নিতে চাইছে? ওর অনুপস্থিতিতে ঘর অনুসন্ধান করে কোন্ তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে গেল শত্রুপক্ষ? সোহেলই বা ওয়ালী আহমেদ সম্পর্কে সাবধান করল কেন গান্ধী গার্ডেনে? ও কি জানতে পেরেছে কিছু?

এমন সময় একটা স্পীড বোটের এঞ্জিন স্টার্ট নেয়ার শব্দ এল কানে। চলে গেল গুংগা ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

সাঈদ চলে যেতেই দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজল রানা। ঘরের ভেতর টাইম বম্ব রেখে যেতে পারে হয়তো। সুটকেসের কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি হয়েছে। এক আধটা কাগজ খোয়াও গিয়ে থাকতে পারে, ঠিক বোঝা গেল না। সারা ঘরে অস্বাভাবিক কিছুই খুঁজে পাওয়া গেল না। ড্রয়ার, আলমারি, আলমারির ছাদ, ওয়াল ক্লকের ভেতর, বিছানার তলা, এমন কি ভেন্টিলেটার পর্যন্ত দেখল রানা। নাহ্। কোথাও কিছু রেখে যায়নি ওরা। হয়তো রানার সত্যিকার পরিচয় জানবার জন্যে লোক পাঠিয়েছিল ওয়ালী আহমেদ। আর কিছু নয়। অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে কোটটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে জুতো পরেই শুয়ে পড়ল রানা বিছানায়। অন্যমনস্কভাবে ছাতের দিকে চেয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল মাসুদ রানা।

খট্ খট্ খট্। তিনটে টোকা পড়ল দরজায়। রানা ঘড়ি দেখল, সাড়ে নয়টা বাজে। মোহাম্মদ জান কি আগেই এসে গেল? সাঈদের মুখে সব কথা শুনে বোধহয়

হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে।

আবার টোকা পড়ল দরজায়। এবার চারটে। অর্থাৎ অসহিষ্ণু। দরজা খুলেই অবাক হয়ে গেল রানা। দাঁড়িয়ে আছে অনীতা গিলবার্ট।

'ভেতরে আসতে পারি?' জিজ্ঞেস করে উত্তরের অপেক্ষা না করেই রানাকে ঠেলে ঢুকে এল অনীতা ঘরের ভেতর। 'দরজাটা বন্ধ করে দিন। জরুরী কথা আছে।' মেঝেতে হাইহিলের খুট খুট আওয়াজ তুলে দরজা থেকে সব চাইতে দূরের সোফাটায় গিয়ে বসল অনীতা। চমৎকার একটা নীল-চকলেট-সাদা ছিটের স্কার্ট পরেছে সে। চিকন কটিতে কালো বেল্ট। মাথায় কালো নেটের স্কার্ফ—গলার কাছে গিট দেয়া। মুখে সযত্ন প্রসাধন, ঠোঁটে ঘন করে লিপস্টিক। বিকেলের সেই আলুথালু মেয়েটা বলে চেনাই যায় না আর। এই প্রথম রানা উপলব্ধি করল, মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী।

দরজা বন্ধ করে বসল রানা মেয়েটির মুখোমুখি।

'তারপর, হঠাৎ?' জিজ্ঞেস করল রানা সপ্রশ্ন দৃষ্টি মেলে।

'হঠাৎ নয়। তোমার জন্যে সাড়ে ছ'টা থেকে অপেক্ষা করছি আমি। তোমার ওই কাউ-বয় বন্ধুটা বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আসতে পারছিলাম না। আমার অনেক কথা আছে—সব শুনবার সময় হবে তোমার?'পরিষ্কার বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বলল অনীতা।

'না। মেয়েমানুষের কথা কোনদিন শেষ হয় না। আর অনেক কথা থাকলে তো রীতিমত বিপজ্জনক!' হাসল রানা। 'তাছাড়া আর আধ ঘন্টার মধ্যেই বেরোতে হবে আমাকে। একজন ভদ্রলোক আসবেন।'

'তাহলে খুব সংক্ষেপে সারতে হবে আমার সব কথা।'

রানা উঠে দু'কাপ কফি তৈরি করে একটা নিজে নিল আর একটা নামিয়ে রাখল অনীতা গিলবার্টের পাশে।

'থ্যাঙ্ক ইউ,' এক চুমুক খেয়ে নামিয়ে রাখল অনীতা কাপটা।

'তোমার প্রভু কোথায় ? যীশুর কথা বলছি না, ওয়ালী আহমেদ। আমার ঘরে এসেছ জানতে পারলে—'

'হ্যাঁ! খুন করে ফেলবে। কিন্তু আমি এখন আর তার চাকর নই। আজ সাড়ে ছয়টায় সে আমার পাওনা চুকিয়ে তার ওপর আরও পাঁচ হাজার টাকা বখশিশ দিয়ে বিদায় করে দিয়েছে।'

'তাই নাকি? জোচ্চুরি ছেড়ে দিয়েছে তাহলে তোমার প্রভু ? সুখবর!'

'তোমার জন্যে এটা সুখবর নয়, মি. রানা। সে নিজে ঢুকেছিল তোমার ঘরে বিকেলে তোমরা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তারপরের ঘটনাটুকু আমি জানি বলেই আমার জিনিসপত্র বোনের বাসায় রেখে ফিরে এসেছি আবার।'

আচ্ছা! তাহলে ওয়ালী আহমেদ নিজে এসেছিল তার ঘরে? পরের ঘটনাটুকু শুনবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে উঠল রানার মন। কিন্তু সে-ভাব প্রকাশ করল না, কফির কাপে চুমুক দিল।

'তোমার এই ঘরে কি যে পেল ওয়ালী আহমেদ জানি না। কিন্তু অত্যন্ত উত্তেজিত দেখলাম ওকে। প্রথমেই ওয়্যারলেসে চারদিকে তোমার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা

করল, গাড়ি নিয়ে তোমাকে ফলো করবার আদেশ দিল কাউকে। তারপর ওর অ্যাসেম্বলিং প্ল্যান্টের ম্যানেজারকে ডেকে তোমাকে আজকের মধ্যেই সুযোগ মত পিষে মারবার আদেশ দিল। পি.আই.এ. বুকিং-এ ফোন করে আজ সন্ধ্যার ফ্লাইটে রাওয়ালপিণ্ডির একটা ফার্স্ট ক্লাস টিকেট রাখতে বলল—নিজের নামে। তারপর আমার টাকা-পয়সা চুকিয়ে দিয়ে বিদায় করে দিল । জিনিসপত্র গুছাতে গুছাতে শুনতে পেলাম হোটেলের ম্যানেজারকে ফোন করে বলছে, আজ সন্ধ্যায় জরুরী কাজে পিণ্ডি যাচ্ছে সে—কাজেই সব বিল যেন তৈরি রাখে ছ'টার মধ্যে।'

এতগুলো কথা একসাথে বলে চুপ করল অনীতা । একটা সিগারেট ধরাল প্যাকেট থেকে নিয়ে। কাপে একটা ছোট চুমুক দিয়ে হাতেই ধরে রাখল সেটা। সিগারেটের সাদা কাগজের ওপর লাল লিপস্টিকের দাগ পড়েছে।

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। কোনও কথা বলল না । চেয়ে রইল মেয়েটির দিকে।

'তোমার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে এসব কথা আমি তোমাকে বলছি কেন? সে কথায় পরে আসছি। আগে এখন এইসব ঘটনা থেকে আমার ডিডাকশনটা শোনো। যদিও তুমি বলেছিলে আই.বি. বা পুলিসের লোক তুমি নও, কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস তুমি এমন কোন সরকারী বিভাগের লোক যাকে শেষ না করতে পারলে বিপদে পড়বে ওয়ালী আহমেদ। কারণ, তোমার ঘরে ঢুকবার আগে ওকে খুব খুশি দেখেছিলাম। আমাকে তোমার সম্পর্কে বলেছিল,'এতদিনে সত্যিকার একটা উপযুক্ত লোক পাওয়া গেল। মাসে বারো হাজার টাকা দিতে হলেও এই লোককে রাখব আমি সহকারী বানিয়ে।' তোমার ঘর থেকে ঘুরে আসতেই ওর চেহারা দেখে চমকে উঠেছিলাম আমি। তারপরের ঘটনা তো বললামই। ট্রাক দিয়ে পিষে মারার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হইনি। স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক ইনটিউইশনের বলে আমি জানতাম অত সহজে তোমাকে ঘায়েল করতে পারবে না ওরা।'

'করে এনেছিল প্রায়,' বলল রানা।

'কিন্তু পারেনি।' কথাটা ওখানেই থামিয়ে দিয়ে নিজের কথায় ফিরে গেল অনীতা। 'আর ওয়ালী আহমেদ যাতে এসব ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়ে, সেজন্যে আমার যতদূর বিশ্বাস ওর নাম নিয়ে ওর মত দেখতে কোনও লোক চলে গেছে রাওয়ালপিণ্ডি আজ সন্ধ্যার ফ্লাইটে। কাগজে-কলমে ওয়ালী আহমেদ আর করাচিতে নেই এখন।'

'কিন্তু আসলে সে সশরীরে করাচিতেই আছে, এই তো বলতে চাও? এর পেছনে তোমার কি যুক্তি ?'

'তিনমাস ছিলাম আমি ওর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে। হাড়ে হাড়ে চিনি আমি ওকে। ও যে কী পরিমাণ ভয়ঙ্কর লোক তা ভাষায় বোঝানো অসম্ভব। জিনাত সুলতানা ওর কুপ্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছে—অবাধ্যতা করে অপমান করেছে ওকে। আজ পর্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক ওর হাত থেকে নিস্তার পায়নি। জিনাতও পাবে না । ছলে-বলে-কৌশলে সে ধূলিসাৎ করবে জিনাতের অহঙ্কার। আত্মসমর্পণ করতেই হবে তাকে ওয়ালী আহমেদের কাছে। তার আগে সে নড়বে না করাচি থেকে এক পা-ও।'

সিগারেটের ছাই ঝাড়ল অনীতা। হালকা করে একটা টান দিল সেটাতে, তারপর ফেলে দিল অ্যাশ-ট্রেতে। সোজা রানার চোখের দিকে চাইল এবার সে।

'আমি তোমাকে সাবধান করে দিতে এসেছি, রানা।'
'কারণ কি, সুন্দরী? আমাকে খুন করা হলে তোমার তো কোনও ক্ষতি দেখি না।'
'ক্ষতি আছে। তোমাকে আমি কিছুতেই মরতে দেব না।' রানাকে অবাক হয়ে চাইতে দেখে আবার বলল,'তুমিই এখন আমার একমাত্র ভরসা, রানা।'
'প্রথম দর্শনেই প্রেম মনে হচ্ছে!' কৌতুক বোধ রানা।
হেসে ফেলল অনীতা। সোনা বাঁধানো একটা দাঁত চক্ চক্ করে উঠল। এক ঢোক কফি গিলে নিয়ে বলল,'শুনতে ওই রকমই লাগছে, তাই না? আমি দেখেছি, পুরুষ মানুষকে ঈশ্বর হ্যাণ্ডসাম করে বানালেও মাথায় পাঁঠার বুদ্ধি দিয়ে দেয়। সবক্ষেত্রেই তাই। তোমার বেলায় একটু অন্যরকম ভেবেছিলাম। আজ বিকেলে খানিকটা বুদ্ধির ঝিলিক দেখেছিলাম কিনা, তাই। শোনো হে, আকর্ষণীয় যুবক, তোমার প্রেমে আমি পড়িনি। মেয়েমানুষের প্রেম অত সহজ নয়। তোমাদের মত যেখানে সেখানে ধুপ-ধাপ প্রেমে আমরা পড়ি না।' রানার দিকে তেরছা করে চেয়ে মুচকে হাসল অনীতা। 'তোমার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি আমি, রানা।'
'সাহায্য?'
'হ্যাঁ, সাহায্য। আমি জানি, কেউ যদি আমাকে সাহায্য করবার শক্তি, সাহস, আর বুদ্ধি রাখে; সে হচ্ছ তুমি। আমি যখন অপমানের জ্বালায় তিলে তিলে দগ্ধে মরছি, কালনাগিনীর মত বিষাক্ত ছোবল তুলে প্রতিশোধ নেবার জন্যে সুযোগের প্রতীক্ষা করছি, ঠিক সেই সময় তুমি এসেছ আমার জীবনে প্রেরিত-পুরুষের মত। সাহায্য করবে আমাকে, রানা?'
কথাগুলো বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে গেল অনীতা গিলবার্ট। করুণ মিনতি ফুটে উঠল ওর চোখে। সমস্ত সত্তা একাগ্র হয়ে উঠেছে ওর রানার উত্তর শুনবার জন্যে।
'কিসের প্রতিশোধ, অনীতা?'
রানা বুঝল এই মেয়েটির জীবনের কোনও দুর্বিষহ সত্যের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে সে। নিতান্ত ঘটনাচক্রে। হৃদয়ের মস্ত একটা ব্যথা উন্মোচন করে দেখাবে মেয়েটি আজ তাকে। খামোকা এক কাজে এসে অন্য কাজে জড়িয়ে পড়বার আশঙ্কায় একটু উদ্বিগ্ন হলো রানা মনে মনে। কিন্তু বড় আশা করে এসেছে, ওকে ফেরাবেই বা কি বলে?
'অপমানের। স্ত্রীলোক প্রকৃতির মতই সর্বংসহা। পুরুষের অনেক অত্যাচার, অনাচার আর কঠিন আঘাত সহ্য করতে পারে সে হাসিমুখে। পুরুষের বুনো স্বভাবের জন্যে আরও বেশি করে ভালবাসে সে তাকে। এটা নারীর ধর্ম। পুরুষরা যখন নাটক নভেলে সতী-সাধ্বী স্ত্রীলোকের ওপর হৃদয়হীন পুরুষের অমানুষিক অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করে হা-হুতাশ করে তখন আমরা মনে মনে হাসি। আমরা যাকে মন দিই, তার কোনও অত্যাচারই আর অত্যাচার মনে হয় না আমাদের কাছে। কিন্তু একটা জিনিস নারী কোনদিন সহ্য করতে পারে না, কোনদিন ক্ষমা করে না—সে হচ্ছে অপমান।' এসব কথা শুনতে রানার অস্বস্তি লাগছে বুঝতে পেরে আবার বলল, 'ঘটনাটা খুলে বলছি।'
কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল অনীতা। তারপর বলল, 'তিন মাস আগে আমি

এয়ার হোস্টেস ছিলাম। কায়রো থেকে করাচি ফিরছিলাম। সেই প্লেনেই পরিচয় ওয়ালী আহমেদের সাথে। ও প্রস্তাব দিল ওর সাথে ডিনার খাওয়ার। ডিনারে আপত্তি আমার কোনদিনই ছিল না, এখনও নেই। তাছাড়া খ্রিস্টান সমাজে খোলামেলা পরিবেশে মানুষ হয়েছি আমি। কাজেই নির্ভয়ে রাজি হয়ে গেলাম। ক্যাপ্টেনের কাছে অনুমতি চাইতেই মৃদু হেসে অনুমতি দিয়ে দিল সে।'

'সেই রাতেই প্রথম এলাম আমি এই হোটেলে ওয়ালী আহমেদের কামরায়। ডিনার শেষ হতেই বাড়াবাড়ি রকম ঘনিষ্ঠ আচরণ শুরু করল ওয়ালী আহমেদ। আমি আপত্তি করলাম। কিন্তু এইমাত্র ওর পয়সায় তৃপ্তির সঙ্গে জীবনের শ্রেষ্ঠ ডিনার খেয়ে উঠে তেমন জোর করে কিছু বলতেও পারলাম না। তাছাড়া, একজন পুরুষের সাথে মেয়েমানুষ গায়ের জোরে পারবে কেন?' লাল হয়ে উঠল অনীতার মুখ। নিচের ঠোঁটটা কাঁপছে। কামড়ে ধরে সেটাকে সংযত করবার চেষ্টা করল সে। অপলক চোখে চেয়ে শুনছে রানা একটি নারীর চরম লজ্জার কথা।

'পারলাম না। পাশের ঘর থেকে হিংস্র গর্জন ছেড়ে এ-ঘরে ঢুকল মিশমিশে কালো বিশাল এক দৈত্য। জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। ওপরের ঠোঁট কাটা। দাঁত আর মাড়ি বেরিয়ে আছে।'

'গুংগা!'

'হ্যাঁ। আঁৎকে উঠে ওয়ালী আহমেদের হাত থেকে ছুটে দরজার কাছে চলে গিয়েছিলাম, বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে এল পিশাচটা। এক হাতে চুলের মুঠি ধরে শূন্যে তুলে ফেলল আমাকে। তারপর মারল···এবং অপমান করল।'

দুই হাতে মুখ ঢেকে কান্নায় ভেঙে পড়ল অনীতা। ফুলে ফুলে উঠছে ওর পিঠ। একটু সামলে নিয়ে বলল। 'ওই পিশাচটা আমার সম্ভ্রম···'

'থাক, অনীতা। আর বলতে হবে না।' উঠে গিয়ে ওর পিঠে হাত রাখল রানা। ওর মনের সমস্ত দ্বিধা আর সন্দেহ দূর হয়ে গেছে। বলল, 'আমি তোমাকে সাহায্য করব। খোদার কসম। তোমার এই অপমানের কথা আমি ভুলব না। যেমন করে হোক প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়ব।'

কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল অনীতার চোখ মুখ। যেন এই একটি কথায় হালকা হয়ে গেল ওর মনের বোঝা। বলল,'সেই থেকে অপেক্ষা করছি আমি সুযোগের। সাগ্রহে রাজি হয়ে গিয়েছিলাম ওর প্রাইভেট সেক্রেটারি হবার প্রস্তাবে। প্রতিশোধ আমি নিতাম। কিন্তু আজ আমাকে বিদায় করে দিয়ে পালিয়ে গেছে ও আমার নাগালের বাইরে। তাই এসেছি তোমার কাছে। ধন্যবাদ, রানা। কৃতজ্ঞ বোধ করছি আমি তোমার কাছে।'

ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে ছোট্ট একটা আয়না বের করে আবার মেক্ আপ নিল অনীতা। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে সন্ত্রস্ত পায়ে।

নয়

এতে কিছুই প্রমাণ হয় না। ভাবছে রানা।

পুলথ্রু দিয়ে পিস্তলটা পরিষ্কার করছে সে। শুধু পাথর ফেলা ছাড়া ওয়ালী আহমেদের সাথে স্বর্ণমৃগের কোনও যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে না। দুইজন একই ব্যক্তি কিনা তা এই সামান্য সূত্র ধরে হলফ করে বলা যায় না। দেখা যাক, আজ মোহাম্মদ জানের সঙ্গে গিয়ে যদি নতুন কোনও তথ্য আবিষ্কার করা যায় তখন বোঝা যাবে। গুণে গুণে আটটা গুলি ভরে নিল রানা ম্যাগাজিনে। স্লাইড টেনে চেম্বারে একটা গুলি ভরল । ম্যাগাজিনটা ঢুকিয়ে দিল যথাস্থানে। ক্লিক্ করে ক্যাচের সাথে আটকে গেল সেটা। সেফটি ক্যাচ 'অফ' অবস্থায় যন্ত্রটা শোল্ডার হোলস্টারে ঢুকিয়ে দিল। দ্রুত কয়েকবার পিস্তল বের করা প্র্যাকটিস করল। ঠিক জায়গা মতই বারবার হাত পড়ছে দেখে নিশ্চিন্ত মনে বাইরের ঘরে গিয়ে বসল।

মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করতেই এল মোহাম্মদ জান। একা। ম্যানেজারের সাথে দুই-একটা জরুরী কথা বলেই বেরিয়ে এল রানা হোটেলের বাইরে। মোহাম্মদ জানের ওপেল রেকর্ড দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভার বেরিয়ে এসে দরজা খুলে দিল।

'সাঈদের কাছে শুনলাম পাথর পড়ার কথা। পাথরটাও দেখলাম। দেখছি রীতিমত জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'এখন আমরা চলেছি কোথায়?'

'সাদারে। কয়েকটা আড্ডায় যাব আমরা। আগেই খবর দিয়েছি, লোক থাকবে আমার। আমার মালাকান্দের লোক—করাচিতে এখন স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেছে। কিছু না কিছু খবর বেরোবেই, দেখো তুমি।'

রানা চুপ করে ভাবছে অনীতা গিলবার্টের কথা।

'ওহ্-হো! আসল কথাই তো ভুলে গেছি।' আবার বলল মোহাম্মদ জান। 'তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, রানা। পরিবর্তনটা লক্ষ করছ জিনার? দেখেছ, একদিনেই কেমন অন্য মানুষ হয়ে গেছে? জীবনে যে-কাজ করেনি, দেখে এলাম সেই কাজ করছে। গুনগুন গান গাইছে আর ঘর-দোর গোছাচ্ছে। কাল যে জন্মদিন! তোমাকে কি বলব, মেজর, আমার খুশি আমি চেপে রাখতে পারছি না কিছুতেই। বাঁচালে তুমি আমাকে, বাবা। মনে হচ্ছে আমার বুকের ওপর থেকে মস্ত ওজনের একটা পাথর কেউ সরিয়ে দিয়েছে। আজ সাত বছর এমন স্বস্তির নিঃশ্বাস আর ফেলিনি। মারি পাঠাবার বোধহয় আর দরকারই হবে না।' রানাকে নড়ে চড়ে উঠতে দেখে চট করে কথা পাল্টাল, 'অবশ্য তাও পাঠাতে হবে। ভাল ডাক্তার দিয়ে থরো চেকাপ করাতেই হবে। কিন্তু সত্যি বলতে কি আমার আর ভয় নেই একফোঁটাও। খোদার কাছে হাজার শোকর, কোথা থেকে তোমাকে এনে হাজির করেছেন তিনি ঠিক সময় মত।'

উচ্ছ্বসিত আনন্দে বক বক করতে থাকল স্নেহান্ধ পিতা। বড় বড় রাস্তা পেরিয়ে গাড়ি চলেছে এখন অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা ধরে। একটা সাইনবোর্ডে পড়ল রানা এল্ফিন্স্টন স্ট্রীট, তারপর পড়ল ওরা ভিক্টোরিয়া রোডে।

মোড় ছাড়িয়ে কিছুদূর গিয়েই দাঁড়াল গাড়ি। রাস্তার ডানধারে 'কাফে জর্জ'। বেরিয়ে এল রানা ও মোহাম্মদ জান গাড়ি থেকে। মাটির তলা দিয়ে রাস্তা পার হওয়ার ব্যবস্থা। রাস্তায় গাড়ি ঘোড়ার ভিড় কমে গেছে অনেক—তবু আণ্ডারগ্রাউণ্ড

ক্রসিং দিয়ে ডান ধারে এসে দাঁড়াল ওরা কাফে জর্জের সামনে। বাইরে থেকে দেখতে নোংরা, অথচ ভিতরটা গমগমে, লোক ভর্তি। বাইরেই একটা প্রকাণ্ড উনুনে সারি সারি শিক ঝলসানো হচ্ছে। সুগন্ধ এল নাকে। ঢুকে পড়ল ওরা কাঁচের দরজা ঠেলে। রানা লক্ষ করল এদিক-ওদিক থেকে কয়েকজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে সালাম করল মোহাম্মদ জানকে। সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেল মোহাম্মদ জান ঢোলা পাঞ্জাবী আর বিশ গজী পাজামায় খশখশ আওয়াজ তুলে।

কোণের টেবিলে একজন গুণ্ডা কিসিমের লোক বসে ছিল। ডান চোখের নিচ থেকে উপরের ঠোঁট পর্যন্ত একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। ঝাঁকড়া মাথার চুল। গলায় তাবিজ। মোহাম্মদ জানের সাথে চোখের ইঙ্গিতে কিছু ভাব বিনিময় হলো—রানা সেটা খেয়াল না করার ভান করে সোজা ঢুকে গেল একটা কেবিনে মোহাম্মদ জানের পিছু পিছু। তিন শিক আর তিন চায়ের অর্ডার দিল সর্দার।

মিনিট কয়েক পরেই কেবিনের পেছনে একটা দরজা খুলে গেল। ঘরে প্রবেশ করল সেই গুণ্ডা। পরিষ্কার ডাকাতের চেহারা। মোহাম্মদ জানের পায়ে ধরে সালাম করল সে, তারপর বসল একটা চেয়ার টেনে নিয়ে। মুখে ভয়ঙ্কর একটা নিঃশব্দ হাসি। কেবিনের পর্দাটা আগেই টেনে দিয়েছে মোহাম্মদ জান।

নিচু গলায় অনর্গল কথা বলল কিছুক্ষণ দু'জনে পশতু ভাষায়। বার কয়েক মাথা ঝাঁকাল গুণ্ডাটা। রানার দিকে অবাক চোখে চাইল কয়েকবার। হঠাৎ রানার দিকে লক্ষ পড়তেই লজ্জিত হয়ে মোহাম্মদ জান বলল, 'আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমার এই বন্ধু একবিন্দুও বুঝতে পারছেন না আমাদের আলাপ। উর্দুতেই কথা বলা উচিত ছিল আমাদের।'

কথার ভঙ্গিতে রানা বুঝল জেনে শুনেই পশতুতে কথা বলেছে মোহাম্মদ জান। তিন প্লেটে শিক কাবাব, সাথে তিনটে গরম নান-রুটি আর তিন পেয়ালা চা ঠক ঠক করে টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে চলে গেল বেয়ারা। বাকি কথাবার্তা উর্দুতেই হলো।

'তা তোমরা সোনা দাও কার কাছে?' পোয়াটেক কাবাব মুখে ফেলে অবশিষ্ট ফাঁকটুকু দিয়ে জিজ্ঞেস করল মোহাম্মদ জান।

'আমরা কারো কাছে দিই না, সর্দারজী। তারাই আমাদের খুঁজে বের করে নিয়ে যায় মাল। দেড় বছর আগে আমরা যাদের কাছে যেতাম তারা আর মার্কেটে নেই। তারাও এখন আমাদের মত সাপ্লায়ার হয়ে গেছে। এখন হঠাৎ কোথা থেকে এক একদিন একেক জন আসে, নগদ টাকা দিয়ে মাল নিয়ে যায়। যাবার সময় একটা সঙ্কেত বলে যায়—সেই সঙ্কেত দিলেই আমরা নতুন লোককে চিনতে পারি, নির্ভয়ে মাল দিই। আমাদের কাজ হলো শুধু মাল জমা করে রেডি রাখা। ব্যস্। এর বেশি জানতে গেলেই সাফ করে দেয়। পর পর চার পাঁচজন খুন হয়ে যাবার পর আমরা আর সে চেষ্টা করি না।'

'কিন্তু বছর দেড়েক ধরে যে নতুন লোকটা কারবার করছে, একটা লোকও তাকে চাক্ষুষ দেখেনি, এ কেমন কথা? তোমাদের কেউ কখনও দেখোনি ওদের লোক যায় কোথায়? পিছু নাওনি কখনও?'

'বললাম তো। আপনি সর্দার। আপনার সাথে ঝুট বললে খোদার কাছে ঠেকা

থাকব। চার পাঁচজন চেষ্টা করেছিল। ওদের লাশ পাওয়া গেছে।'

'ওরা চেষ্টা করতে গিয়েছিল কেন?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'কৌতূহল।'

'তাহলে দেখা যাচ্ছে, আসল লোকটা খুবই সাবধানে নিজেকে গোপন রাখতে চায়?'

'খুব।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ আহার করল তিনজন। প্লেট খতম করে তশতরির ওপর আধ কাপ চা ঢেলে নিয়ে ফড়ফড় করে টানছে ডাকাতটা। নীরবতা ভঙ্গ করল মোহাম্মদ জান।

'আল্লারাখার কাছে কোন খবর পাওয়া যাবে? করাচিতে আছে না এখন?'

'জ্বী, সর্দার। তবে ওর কাছ থেকেও কোন খবর পাবেন বলে মনে হয় না। এক সাঙ্ঘাতিক দল।'

'তুমি পর্যন্ত এ ধরনের কথা বলছ, দিল্লির? তুমি না মালাকান্দের ছেলে? এদেশে এসে বিড়ালের বাচ্চা বনে গেলে?'

চুপ করে বকা হজম করে নিল দিল্লির খান।

'তাহলে দেখছি অন্যের কাছে যাওয়া বেকার। আমাকেই নামতে হবে ময়দানে। খবরটা আমার চাই-ই।'

'আমরা থাকতে আপনি কেন ময়দানে নামবেন, সর্দারজী? আমরা খতম হয়ে গেলে তারপর নামবেন আপনি। তার আগে নয়। আপনি শুধু হুকুম করুন, সর্দার।'

'দিন কয়েক অপেক্ষা করলে আসবে না ওদের লোক?'

'আসবার সময় হয়ে গেছে, সর্দার। আজও আসতে পারে, কালও। কিন্তু আমি জানি, ওদের সাথে বেঈমানী করলে আর রক্ষা নেই। কবর থেকে খুঁড়ে তুলে মারবে। আপনি হুকুম করলে মৃত্যুকে পরোয়া করব না, সর্দার।'

'আমি হুকুম করছি। তোমার যাতে কোনও বিপদ না হয় সেদিকে লক্ষ রাখব আমরা।'

হাসল দিল্লির ওর ভয়ঙ্কর নিঃশব্দ হাসি।

'আপনার হুকুম আমার শিরোধার্য, সর্দার। আমি মালাকান্দের কু-সন্তান। কিন্তু যত দূরেরই হোক, আপনার রক্ত আমার শরীরেও আছে।' পা ছুঁয়ে কপালে ঠেকাল দিল্লির। 'আর আমার বিপদের দিকে লক্ষ রাখার কোনও দরকার নেই--কোনও লাভ হবে না তাতে। আপনি আমার পরিবারের ভার গ্রহণ করলে নিশ্চিন্তে জান দিতে পারব আমি। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, সর্দার, সে-লোক আপনাকেও ছাড়বে না।'

রানা ভাবল, কী আশ্চর্য ক্ষমতা এই ট্রাইবাল চীফদের। সাধারণ লোকের কাছে ঈশ্বরের নিচেই এদের স্থান। লোকটা স্থির নিশ্চিত যে কেউ ওর মৃত্যু ঠেকাতে পারবে না— বেঈমানী করলে খুন হতেই হবে। তবু সে এক কথায় রাজি!

'আচ্ছা, এই গ্যাঙের শেষ মাথায় কি ধরনের লোক আছে বলে তোমার ধারণা?' রানা জিজ্ঞেস করল।

'ভদ্রলোক।' ডান ভুরুটা উপর উঠিয়ে রানার দিকে চাইল দিল্লির খান।

'কানাঘুষোয় শুনেছি আশ্চর্য এক বুদ্ধিমান লোক এসেছে এখন এই ব্যবসায়ে। পুলিসের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সে নাকি সারা পশ্চিম পাকিস্তানের ক্রিমিনালদের নিয়ে মস্ত শক্তিশালী একটা দল তৈরি করতে চায়। তাই লোক বাছাই করছে'। পাঁচ হাজার থেকে বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত তনখা দেবে মাসে মাসে, গুণ অনুসারে। সবই শোনা কথা। টুকরো টুকরো এর-ওর কাছ থেকে শোনা। আমাদের মধ্যে প্রবল একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে এই নতুন লোককে ঘিরে।'

'আচ্ছা, দিল্লির খান, দু'মিনিট ভেবে উত্তর দাও। তোমাদের মধ্যে কেউ কি ওদের আড্ডার কোনও উড়ো খবরও রাখে না? খালি একটা ঠিকানা পেলেই তোমাকে আর বিপদের মধ্যে টানব না আমরা। তোমার বালবাচ্চাকে এতিম করবার ইচ্ছে আমাদের নেই। শুধু একটা ঠিকানা।'

চট্ করে রানার মুখের দিকে চাইল একবার দিল্লির খান। কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে ভাবল। তারপর ধীরে ধীরে চিন্তান্বিত ভাবটা দূর হয়ে গেল মুখের ওপর থেকে। মনের গভীরে হাতড়ে পেয়েছে সে এক টুকরো বাঁচবার অবলম্বন। উদগ্রীব হয়ে চেয়ে রইল রানা।

'সেখানে গেলে কোনও লাভ হবে কিনা বলতে পারি না। হয়তো সেখানে গিয়েছিল লোকটা অন্য কাজে। কিন্তু আমি একটা দোকানে ঢুকতে দেখেছি একজনকে। চোখের ভুলও হতে পারে। তবে আমার যতদূর বিশ্বাস এই লোকটাই দশ মাস আগে আমার কাছ থেকে সোনা নিয়েছিল পাঁচশো ভরি।'

'কিসের দোকান?' টেবিলের উপর দুই বাহু রেখে সামনে ঝুঁকে এল রানা।

'মাছের!' ফিস্ ফিস্ করে বলল দিল্লির খান।

মাছের বাজার মনে করে হতাশার চিহ্ন ফুটে উঠল রানার মুখে। তাই আবার বলল দিল্লির খান, 'ওই মাছ না। ছোট ছোট রঙিন সব মাছ। কাঁচের বাক্সে রাখা। জ্যান্ত। যেদিন দেখলাম লোকটাকে ওই দোকানে ঢুকতে সেদিন থেকে ওই রাস্তা দিয়ে হাঁটি না আমি।'

কাগজ বের করে ঠিকানাটা লিখে নিল রানা। কাছেই, ভিক্টোরিয়া রোডের ওপরই দোকানটা।

'যদি এ ঠিকানায় কিছু পাওয়া না যায় তাহলে হয়তো তোমার সাহায্য নিতেই হবে, দিল্লির খান,' বলল রানা।

'বেশক্। কিন্তু সাবধান, জনাব! দুশমন বড় হুঁশিয়ার।'

চোখ পাকিয়ে কথাটা বলে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল দিল্লির খান। গেলাস ঠুকে বেয়ারাকে ডাকা হলো। বিল চুকিয়ে বেয়ারাকে মোটা বখশিশ দিয়ে আবার গাড়িতে চাপল ওরা। ড্রাইভারকে ঠিকানাটা বুঝিয়ে দিল মোহাম্মদ জান। মাথা নেড়ে 'জী, সর্দার' বলেই গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটল ড্রাইভার নির্জন হয়ে আসা রাস্তা ধরে।

অনেক দোকান সারি সারি। বেশির ভাগই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কোনও কোনটা সামান্য একটু খোলা—ভেতরে হিসাব-কিতাব হচ্ছে সারাদিনের বিকিকিনির। গাড়ি এসে থামল ফুটপাথের ধারে। নীল নিয়নে সুন্দর করে ইংরেজিতে লেখা: ফিশ এমপোরিয়াম। নামটা চেনা চেনা লাগল। কোথায় দেখেছে?···মনে পড়ল রানার,

এই নামটা দেখেছে চিটাগাং-এর 'বিপণী বিতানে'। এদেরই ব্রাঞ্চ নাকি? নাকি এটাই ওদের ব্রাঞ্চ?

বাইরে থেকে দেখা গেল কাঁচের শো-রুমে সুন্দর করে সাজানো আছে কয়েকটা অ্যাকুয়ারিয়াম। কয়েকটা শেল্‌ফে সাজানো বিচিত্র বর্ণ ও আকারের ঝিনুক আর শঙ্খ। পেছনে কালো পর্দা টাঙানো আছে বলে দোকানের ভেতরের চেহারাটা বাইরে থেকে বোঝা গেল না। একদিকের শাটার টেনে নামানো হয়েছে। আরেকটাও নামানোর উদযোগ হচ্ছে। বন্ধ করছে দোকান।

ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রানা একবার ভাবল আজ ফিরে যাবে কিনা। কাল এলেই বোধহয় ভাল হয়। কিন্তু খরিদ্দার দেখেই উৎসাহিত কণ্ঠে ভেতর থেকে ডাক দিল একজন। ঢুকে পড়ল ওরা দোকানের ভেতর।

চারপাশে কেবল মাছ আর মাছ। মাঝের সরু একটা প্যাসেজ দিয়ে কিছুদূর গেলে অফিস ঘর। দোকানে পা দিতেই সজাগ হয়ে উঠল রানার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। মনের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল, 'সাবধান! সামনে বিপদ!' আশ্চর্য এক ক্ষমতার বলে কি করে জানি আগে থেকেই বিপদ টের পায় রানা, এবার বড্ডো দেরি হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে পড়েছিল রানা, কিন্তু মোহাম্মদ জান সোজা ঢুকে গেছে ভেতরে, তাই সে-ও চলল পেছন পেছন। বাম বাহু দিয়ে চেপে একবার অনুভব করল স্প্রিং লোডেড্ শোল্ডার হোলস্টারটা। দ্রুত পা ফেলল সে মোহাম্মদ জানের কাছাকাছি থাকার জন্যে।

হরেক সাইজের অ্যাকুয়ারিয়াম। ছোট, বড়, মাঝারি। তার মধ্যে সুন্দর সুন্দর রঙিন সব মাছ খেলে বেড়াচ্ছে। ট্রপিকাল ফিশ একদিকে, সল্টওয়াটার ফিশ অন্যদিকে। প্রত্যেকটি জারের ওপর আলোর ব্যবস্থা আছে। নানান রকম গাছ, শেওলা জাতীয় উদ্ভিদ লাগানো আছে কাঁকর ও বালিতে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্বুদ উঠছে সুন্দর সব স্টোন থেকে। সুন্দর সুন্দর ঝিনুক, শঙ্খ রুচিসম্মতভাবে ছড়ানো বালির ওপর।

'আসুন, স্যার, আসুন। এক্ষুণি সেল ক্লোজ করতে যাচ্ছিলাম। কি মাছ লাগবে আপনার? বার্থডে প্রেজেন্টেশান?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানাল রানা। ভাবল, হঠাৎ জন্মদিনের কথা মনে হলো কেন ব্যাটার? বড়লোকেরা বোধহয় বার্থ ডে-তে মাছ উপহার দেয়। নইলে চলবে কি করে এসব দোকান? লোকটার মুখের ওপর স্থির দৃষ্টি রাখল রানা। গোলগাল মুখটা, হাসি-খুশি। যেন দুঃখ কাকে বলে জানে না। অমায়িক হাসি লেগে আছে সব সময় ঠোঁটের কোণে।

'তাহলে, স্যার, অ্যাঞ্জেল ফিশ নিন। চমৎকার একজোড়া ব্ল্যাক অ্যাঞ্জেল আছে। ম্যাডাগাস্কার থেকে আনা। মাত্র পাঁচশো টাকা। দেখবেন? আসুন আমার সঙ্গে।'

পিছন ফিরে লোকটা হাঁটতে আরম্ভ করবে এমন সময় রানা বলে বসল, 'আমরা চাইছি গোল্ড ফিশ। ভাল কোন ভ্যারাইটি আছে?' ভেতরের দিকে যেতে চাইছে না রানা।

'কি যে বলেন, স্যার! নেই? কত রকম ভ্যারাইটি চান? চোখ ধাঁধিয়ে যাবে

আপনার। আসুন আমার সঙ্গে।' এবার আর কোনও কথাতেই কান না দিয়ে পিছন ফিরে হাঁটতে থাকল লোকটা।

কয়েক পা এগিয়েই মোহাম্মদ জানেরও বোধহয় রানার সেই অনুভূতিটা হলো। থেমে পড়েই পেছন ফিরল সে। রানার পেছনে তিনজন ষণ্ডা মার্কা লোক দেখতে পেল সে। ঘড় ঘড় করে নেমে গেল শাটারটা। ফ্যাকাসে হয়ে গেল মোহাম্মদ জানের মুখ। বুঝল, বাঘের খাঁচায় ঢুকে পড়েছে। বেরোবার উপায় নেই। রানা চোখ টিপল একবার। মৃদু হাসির চেষ্টা করল মোহাম্মদ জান, কিন্তু সেটা মুখ বিকৃতির মত লাগল দেখতে। বোঝা গেল দমে গেছে সে। দিল্লির খানের কথা মনে পড়ল। 'বেশি জানতে চাইলেই সাফ করে দেয়···কয়েকজন চেষ্টা করেছিল। ওদের লাশ পাওয়া গেছে।'

একটা বড় অ্যাকুয়ারিয়ামের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। পানির মধ্যে বালি আর পাথরের কুচির উপর একটা পাত্রের মধ্যে সহস্র বাহু ওপরে তুলে কিলবিল করছে একদলা টিউবিফেক্স ওঅর্ম। ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে গুগুলোকে গোটা কতক গোল্ড ফিশ। রানার সাথে মোহাম্মদ জানের চোখে চোখে কিছু ইঙ্গিত বিনিময় হয়ে গেল। মাছগুলো সম্পর্কে বক্তৃতা আরম্ভ করতে যাচ্ছিল ম্যানেজার, হঠাৎ ধাঁই করে এক লাথি লাগাল মোহাম্মদ জান ম্যানেজারের কাঁকালে। ছিটকে গিয়ে পড়ল লোকটা অ্যাকুয়ারিয়ামের ওপর। কনুয়ের ধাক্কা লেগে ভেঙে গেল কাঁচ। হাতটাও কেটে গেল খানিকটা। ঝর ঝর করে পানি পড়ে ভেসে গেল মেঝে। ছোট ছোট রঙিন মাছগুলো তড়াক তড়াক করে লাফাতে থাকল মোজাইক করা মেঝের ওপর। এবার একটা প্রচণ্ড ঘুষি খেয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল ম্যানেজার। মাটিতে পড়ে মাছগুলোর মতই লাফাতে থাকল লাথি থেকে বাঁচবার জন্যে।

রানাও একই সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে লোকগুলোর ওপর। দড়াম করে নাকের ওপর রানার একটা অতর্কিত ঘুসি খেয়ে ছিটকে সাত হাত দূরে গিয়ে পড়ল প্রথম জন। দ্বিতীয় জনের উদ্দেশ্যে চালাল লাথি। তৃতীয়জন একটু দূরে ছিল—হঠাৎ সে পুকুরে ডাইভ দেয়ার মত সোজা ঝাঁপ দিল রানার পেট লক্ষ্য করে। মুষ্টিবদ্ধ দুই হাতে প্রচণ্ড জোরে এসে পড়ল রানার পেটের ওপর। ধাক্কা সামলাতে না পেরে কয়েক পা পিছিয়ে গেল রানা। ব্যথায় নীল হয়ে গেল ওর মুখ। পিস্তলটা বের করল সে তারই মধ্যে। কিন্তু ঠিক সেই সময় পায়ের তলায় পড়ল একটা গোল্ড ফিশ। সড়াৎ করে পা পিছলে গেল রানার। সাথে সাথেই প্রচণ্ড একটা ঘুসি লাগল ওর বাঁ কানের ওপর। পড়ে গেল রানা। হাঁটুতে লাগল খুব, এবং চোখটা অন্ধকার হয়ে গেল শক্ত মেঝেতে নাক ঠুকে যেতেই। পিস্তলটা হাত থেকে খসে চলে গেল একটা অ্যাকুয়ারিয়াম বসানো টেবিলের নিচে। নাক থেকে রক্ত বেরিয়ে ভেজা মেঝে লাল হয়ে গেল বেশ খানিকটা জায়গা। চোখ দুটো আঁধার হয়ে গেছে। বোঁ বোঁ করে ঘুরছে মাথাটা। তবুও উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সে।

ততক্ষণে আরও কয়েকজন লোক এসে উপস্থিত হয়েছে। মোহাম্মদ জানকে কাবু করে ফেলে হাত দুটো বাঁধা হয়ে গেছে পেছনে। বাঘের বাচ্চার মত গজরাচ্ছে আর ছটফট করছে মোহাম্মদ জান বাঁধন খুলবার ব্যর্থ চেষ্টায়। রানাকেও বেঁধে ফেলা হলো।

কয়েকবার মিট মিট করে চোখের পাতা থেকে পানি সরিয়ে চারদিকে চাইল রানা। বুকের কাছে শার্টের ওপর রক্ত পড়ছে এখনও নাক থেকে টপ্ টপ্। তিন দিক থেকে তিনটে রিভলভার ধরা ওর দিকে। ম্যানেজার উঠে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে একটু বাঁকা হয়ে। এক হাতে ঘষছে লাথি খাওয়া জায়গাটা।

'আগে বাঢ়ো।'

হুকুম করল একজন পেছন থেকে। এগোল ওরা পিছনের ধাক্কায়। কিছুদূর গিয়েই ছোট একটা কামরায় ঢুকল ওদের নিয়ে সব ক'জন। ঘরটা আট ফুট বাই আট ফুট হবে। সাতও হতে পারে। স্টোর রুম মনে হলো। দেয়ালের গায়ে বসানো কয়েকটা বড় সাইজের কাঁচের আলমারি—ভেতরে নানান আকারের বিচিত্র কারুকার্য খচিত সামুদ্রিক ঝিনুক আর শঙ্খ। চার কোণে চারটে অ্যাকুয়ারিয়াম—গায়ে ইংরেজিতে লেখা 'সাবধান! বিষাক্ত মাছ।' একটা জারে বিষাক্ত স্করপিয়ন আর লায়ন ফিশ দেখে চিনতে পারল রানা। ফ্লোরেসেন্ট টিউব জ্বলছে ঘরের মধ্যে।

একটা বিষাক্ত মাছের অ্যাকুয়ারিয়ামের আড়ালে গোপন করা সুইচ টিপল একজন। নামতে আরম্ভ করল ওরা নিচে। রানা বুঝল, ওটা একটা লিফট। মাটির তলায় নিশ্চয়ই আরও ব্যাপার স্যাপার আছে। স্টোর রুম দেখে কেউ ভাবতেও পারবে না যে এটাই মাটির তলায় গোপন আড্ডায় যাওয়ার পথ।

নিচে এসে থামল লিফট। বেরিয়ে এল ওরা বাইরে। চারফুট চওড়া রাস্তা। ডান দিকে অল্পদূর গিয়ে আটফুটি রাস্তায় পড়ল ওরা। কিছুদূর পরপর শেড-বিহীন বাল্ব ঝুলছে সিলিং থেকে। মাটির নিচে গোলক ধাঁধার পাতাল পুরী তৈরি করেছে স্বর্ণমৃগ। গলির দু'পাশে সারি সারি ঘর। এ-গলি, ও-গলি পার হয়ে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর থামল ওরা একটা মোড়ের ওপর। এতক্ষণে মুখ খুলল একজন।

'এবার দু'জন দু'দিকে। শেষ বিদায় নিয়ে নিতে পারো।'

মোহাম্মদ জানের দিকে চেয়ে হাসল রানা। দাঁতে রক্ত। বলল, 'ভাগ্যিস পুলিসে খবর দিয়ে ঢুকেছিলাম এখানে!'

'হ্যাঁ, দশ মিনিটেই হাত কড়া পড়বে ব্যাটাদের হাতে। এতক্ষণে চারদিক ঘিরে ফেলেছে নিশ্চয়ই। আচ্ছা, দেখা হবে।' কথাটা শেষ করেই একটা ধাক্কা খেয়ে বাঁয়ে এগোল মোহাম্মদ জান। চারজন গেল সঙ্গে।

এই মিথ্যে কথায় কোনও রকম চাঞ্চল্য দেখা গেল না ওদের কারও মধ্যে।

একজন হুকুম করল, 'নাথু, তুমি জনা দুই লোক নিয়ে পেছনের পথ দিয়ে বেরোও। রাস্তায় দাঁড়ানো ড্রাইভারকে ধরে প্রথমে আচ্ছামত দূরমুজ করবে, তারপর নিয়ে আসবে ভেতরে। গাড়িটা একজন নিয়ে গিয়ে নুমায়েশ বা গুরুমান্দারের কাছে রেখে আসবে। কিংবা হোটেল মেট্রোপোলের সামনে পার্ক করে রেখে আসতে পারো।'

'আর তুমি এদিকে,' ধাক্কা দিল পেছনের লোকটা রানাকে।

আবার কয়েকটা গলি পেরিয়ে একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কলিংবেল টিপল একজন। ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজা। দরজার ফাঁক জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে গুংগা।

চমকে উঠল রানা। বীভৎস চেহারা। শুধু ল্যাংগোঠ ছাড়া কিছুই নেই সারা

দেহে। রানাকে দেখেই ছোট ছোট চোখগুলো জ্বলজ্বল করে উঠল গুংগার। ঘড়-ঘড় করে একটা শব্দ বেরোল ওর মুখ দিয়ে। থাবা দিয়ে এক হাতে ধরল সে রানার চুল। রানার উরুর সমান মোটা পেশীবহুল সে হাত। অন্য হাতের ইশারায় লোকগুলোকে বিদায় দিয়ে চুলের মুঠি ধরে প্রায় ঝোলাতে ঝোলাতে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল পাশের ঘরে।

সাজানো গোছানো একটা প্রশস্ত ড্রইংরুম। সোফায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিল একজন লোক, পায়ের শব্দে কাগজটা নামাল মুখের সামনে থেকে।

ওয়ালী আহমেদ।

'আসুন। আসুন, মিস্টার মাসুদ রানা। বসুন ওই সোফায়।'

রানাকে বসতে হলো না। বসিয়ে দিল গুংগা চুলের মুঠি ধরে। তার আগেই পেছন দিকে জোরে একটা লাথি চালাল রানা। হাঁটুর নিচে হাড়ের ওপর গিয়ে লাগল স্টীলের পাত বসানো জুতোর গোড়ালি। আর কেউ হলে বাবা-গো, মা-গো বলে বসে পড়ত মাটিতে। কিন্তু আশ্চর্য, একবিন্দু বিচলিত হলো না গুংগা।

'বৃথা চেষ্টা, মিস্টার মাসুদ রানা। ওর শরীর হচ্ছে পেটা লোহা। ও-সবে ওর কিছুই হবে না,' বলল ওয়ালী আহমেদ। 'প্রতিদিন সকালে দু'জন জোয়ান প্যাহেলওয়ান ওর সর্বাঙ্গ মুগুর-পেটা করে মাটিতে শুইয়ে নিয়ে। সে দৃশ্য দেখলে এই সামান্য প্রয়াসে লজ্জা হত আপনার। গত বিশ বছর ধরে এই রুটিন চলে আসছে। এখন এসব সামান্য আঘাত তো কিছুই নয়, তীক্ষ্ণ ছুরির ফলা বা পিস্তলের গুলিও ওর শরীরে প্রবেশ করানো শক্ত।'

কথাটা শেষ করেই মুখ দিয়ে একটুও শব্দ বের না করে কেবল ঠোঁট নাড়াল ওয়ালী আহমেদ গুংগার উদ্দেশে। রানার সারা দেহ সার্চ করে দেখল গুংগা। রুমাল আর টাকা পয়সা বের করে রাখল নিচু টেবিলের ওপর। কোনও অস্ত্র নেই। হাঁটুর নিচে পায়ের সঙ্গে বাঁধা যে ছোরার খাপ থাকতে পারে সে কথা একবারও চিন্তা করল না সে। সন্তুষ্টচিত্তে রানার হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল পিছনে যমদূতের মত।

'আরাম করে বসুন, মিস্টার রানা। আপনার পেছনে যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে, অসম্ভব দ্রুতগতিতে নড়াচড়া করতে পারে সে। কাজেই কোনও রকম কুমতলব থাকলে বিনা দ্বিধায় পরিত্যাগ করাই আপনার জন্যে মঙ্গলজনক হবে। ওর হাত এড়িয়ে আমার কাছে পৌঁছতে পারবেন না আপনি কোনদিন। তাছাড়া আমার হাতের দিকে লক্ষ করলে ছোট্ট একটা যন্ত্র দেখতে পাবেন। যন্ত্রটা ছোট হলেও যথেষ্ট শক্তিশালী। এটাও প্রস্তুত থাকবে। বুঝতে পেরেছেন? এখন আরাম করে বসে দু'একটা খোশ-গল্প করা যাক, কি বলেন?'

রানা চেয়ে দেখল একটা পয়েন্ট টু-ফাইভ ক্যালিবারের স্কেলিটন-গ্রিপ বেরেটো অটোমেটিক ধরা ওয়ালী আহমেদের হাতে। টেবিলের ওপর থেকে রুমালটা তুলে নাক মুখের শুকিয়ে আসা রক্ত মুছে ফেলল রানা। তারপর হেলান দিয়ে বসল ফোম্ রাবারের নরম সোফায়।

'আপনাকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না, মিস্টার মাসুদ রানা। দুই-দুইবার আপনি আমার চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন। বুদ্ধিমান এবং সাহসী লোক আপনি। কিন্তু

শেষ পর্যন্ত আমার খাঁচায় ঢুকতেই হলো আপনাকে।'

রানা ভাবছে, তাহলে ওয়ালী আহমেদই স্বর্ণমৃগ? নাকি এটা কোইনসিডেন্স? রানার করাচি আগমনের হেতুটা কি জানতে পেরেছে ওয়ালী আহমেদ?

'আপনার আক্রমণ আমি আরও আগেই আশা করেছিলাম। এত দেরি হলো কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দেরি কোথায়? যেই মাত্র জানলাম আপনার পরিচয়, তক্ষুণি হুকুম দিয়ে দিলাম। আজ ভাগ্যক্রমে দু'বার বেঁচে গেছেন, আমার কিছু বিশ্বস্ত লোকও খুন করে ওভার-ট্রাম্প করেছেন। কিন্তু আরও অনেক ট্রিক্স ছিল হাতে। আজ রাত পোহাবার আগেই গেম এবং রাবার করে বসে থাকতাম আমি। যাক, ভাল হলো, নিজেই ঠিকানা জোগাড় করে এসে উপস্থিত হয়েছেন।'

'এবং আরও অনেকে শিগগিরই উপস্থিত হবেন।'

'এসে লাভ নেই। যদি তাই হয়, গোপন পথে বেরিয়ে যাব আমরা। তেমন প্রয়োজন হলে এই দোকান বন্ধ করে দেব। আমার আসল কাজে কোন অসুবিধে হবে না। যাক, যা বলছিলাম। আজ বিকেলেই স্থির করলাম আমি, আপনাকে ছাড়া আমার চলবে না। আপনার মত বুদ্ধিমান এবং কৌশলী লোককে হয় নিয়ে নিতে হবে আমার সাথে, নয় সরিয়ে ফেলতে হবে চিরতরে। কাজেই খোঁজ নিলাম। আপনি বিকেলে হোটেল থেকে বেরিয়ে যাবার ঠিক দশ মিনিটের মধ্যেই আপনার মৃত্যু পরোয়ানা প্রচার করলাম আমি।' পান মুখে ফেলল সে একটা।

'আমার অপরাধ?'

'আমার পেছনে লাগতে যাওয়াটা অপরাধ বৈকি।' দুই আঙ্গুলে খানিকটা জর্দা টিপে তুলে ফেলে দিল মুখ-বিবরে।

'আপনার জোচ্চুরি ধরে ফেলায় মৃত্যুদণ্ড? সুবিচারই বটে!'

'সেজন্যে নয়। ন্যাকামি করছেন আপনি। আপনি ভাল করেই জানেন, কেন আপনার মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। আজ বিকেলে আমার জুয়া খেলার কৌশল আবিষ্কার করে ফেলায় আপনার ওপর যার-পর-নাই খুশি হয়েছিলাম আমি। সেই মুহূর্তে মনে মনে আপনার বেতন ধার্য করে ফেলেছিলাম। আপনি এখন পাচ্ছেন মাসে দু'হাজার করে—আমি অবশ্য তখন জানতাম না সে-কথা, পরে জেনেছি। আমি মনে মনে স্থির করেছিলাম আপনাকে মাসে বারো হাজার টাকা বেতন দেব, সেই সাথে হাফ পারসেন্ট কমিশন। অর্থাৎ কোম্পানীর হাজার টাকা লাভ হলে পাঁচ টাকা আপনার। বছর শেষে এই কমিশনই গিয়ে দাঁড়াত দুই লাখে।'

'বাহ্, এ তো চমৎকার অফার! কোন্ বোকা এই সুযোগ ছাড়বে?' টিটকারি মারল রানা।

'কিন্তু দুঃখের বিষয়,' রানার টিটকারিতে কান না দিয়ে বলে চলল ওয়ালী আহমেদ, 'নিরাশ করেছেন আপনি আমাকে। আপনার সম্পর্কে যা তথ্য পাওয়া গেল তাতে দেখা গেল আমার মৃত্যু গহ্বরে প্রবেশ করবার জন্যেই জন্ম হয়েছিল আপনার। আমার জন্যে পাঠানো হয়েছে আপনাকে। আরও খবর নিয়ে জানলাম আজ পর্যন্ত কোনও রকম প্রলোভন দেখিয়েই আপনাকে কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করা যায়নি। কাজেই অন্য পথ থাকল না আমার।'

রানা বুঝল সে খোদ স্বর্ণমৃগের সামনে বসে আছে। আর কিছুক্ষণ আগেই যদি বুঝতে পারত! মিনিট খানেক চুপ থেকে নীরবতা ভঙ্গ করল ওয়ালী আহমেদ।

'আপনি বোধহয় ভাবছেন, আর একটু আগে যদি টের পেতেন যে যার জন্যে এতদূর ধাওয়া করে এসেছেন সে হচ্ছে বিখ্যাত শিল্পপতি ওয়ালী আহমেদ, তাহলে···।'

হাসল ওয়ালী আহমেদ।

'এখনও যদি ছেড়ে দিই আপনাকে, সবকিছু জানার পরেও, তাহলেও আপনি আমার গায়ে একটি আঁচড় পর্যন্ত কাটতে পারবেন না। শত চেষ্টা করেও আমার বিরুদ্ধে একটি প্রমাণ জোগাড় করতে পারবেন না।'

'ছেড়ে দিয়েই দেখুন না!' রানা বলল।

উত্তর দিল না ওয়ালী আহমেদ। ইশারা করতেই দেয়াল আলমারির ভেতর থেকে গ্লাস আর বোতল বের করে আনল গুংগা। ততক্ষণ একটি কথাও না বলে পিস্তলটা রানার পেটের দিকে ধরে থাকল ওয়ালী আহমেদ। গ্লাসটা ভরে দিয়ে আবার রানার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল গুংগা। আবার মুখ খুলল ওয়ালী আহমেদ। গুংগার দিকে চোখ ইশারা করে বলল, 'এ আমার এক অদ্ভুত আবিষ্কার, মিস্টার রানা। এবং গর্বের বস্তু। দেখতে নিগ্রোর মত হলেও ও আসলে পাকিস্তানী নাগরিক। মাকরান থেকে সংগ্রহ করেছি ওকে। আফ্রিকার আদিম অধিবাসীর রক্ত আছে ওর দেহে, তাই ও-রকম চেহারা। লোকটা বোবা এবং কালা। সেই কারণেই বোধহয় আশ্চর্য তীক্ষ্ণ ওর ঘ্রাণ এবং দৃষ্টিশক্তি। তাছাড়াও পাথর ছোঁড়ায় অদ্ভুত রকমের দক্ষতা অর্জন করেছে ও। হোটেলের সামনে তিনমনি পাথরটা আজ সন্ধ্যায় ও-ই ফেলেছিল ছাদ থেকে। ও হচ্ছে কিং-কং গরিলার মনুষ্য সংস্করণ। এমন হিংস্র আর ভয়ঙ্কর প্রাণী জীবনে আর চোখে পড়েনি। মাঝে মাঝে একে কন্ট্রোল করা আমার পক্ষেও শক্ত হয়ে পড়ে।'

লালচে চুলের মধ্যে কয়েকবার হাত চালিয়ে নিয়ে আবার বলল, 'আপনাকে এত খাতির যত্ন করে বসিয়ে এসব বাজে গল্প করে আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করছি কেন, তার কারণ বুঝতে পারবেন কিছুক্ষণ পরেই। ততক্ষণ গল্পটা চালু রাখা যাক। আপনার ওপরওয়ালা শুনেছি খুব বুদ্ধিমান লোক, কিন্তু একাজে আপনাকে পাঠিয়ে উনি মস্ত একটা ভুল করেছেন। আপনার সম্পর্কে যা জানা গেল তাতে বুঝলাম দুঃসাহসিক কাজে পারদর্শিতা, সেই সাথে অল্পবিস্তর কৌশল ছাড়া আর কিছুই পুঁজি নেই আপনার। কিন্তু আমাকে সত্যি সত্যি কাবু করতে হলে অন্য রকম লোকের প্রয়োজন ছিল। আপনাকে শেষ করা ছাগল ধরে জবাই করার মতই সহজ কাজ।'

গ্লাসটা তুলে নিল ওয়ালী আহমেদ। শ্যাম্পেন। দুই ঢোক খেয়ে নামিয়ে রাখল টেবিলের ওপর।

'আচ্ছা, মিস্টার ওয়ালী আহমেদ, আমাকে যখন শেষ করে দেয়াই স্থির করেছেন, তখন নিশ্চয়ই আমার দু'একটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে কৌতূহল মেটাতে কুণ্ঠিত হবেন না?'

'কি ধরনের প্রশ্ন করবেন তার ওপর নির্ভর করবে আমার উত্তর।'

'মৃত্যুর আগে আমি জানতে চাই, কেন আপনি এত টাকার মালিক হয়েও

আবার এই অসৎ কাজে নামলেন।'

'অসৎ কাজ আমি প্রচুর করি। আপনি কোন্‌টার কথা বলছেন?'

'সোনা চোরাচালান।'

'দেখুন, ওটা অসৎ কাজ নয়—অসৎ কাজের একটা উপায় মাত্র। আমি যত টাকা করেছি সবই অসৎ পথে। এতদিন যেভাবে উপার্জন করেছি তা বাইরে থেকে দেখতে ভদ্র-ব্যবসা মনে হলেও তার মধ্যে এতখানি অসততা আছে যে ধরা পড়লে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এমনকি ফাঁসী পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। এটাই আমার লাইন। চিরকাল এ-ই করেছি, ভবিষ্যতেও করব। যত টাকাই হোক না কেন, কেউ আমাকে বিপথ থেকে ফেরাতে পারবে না। আমি বর্ণ-ক্রিমিনাল। চোর পিতার ঔরসে সিফিলিস রোগাক্রান্ত ফকিরণীর গর্ভে আমার জন্ম। শারীরিক কয়েকটা দুর্বলতা থাকলেও প্রতিভা নিয়ে জন্মেছি আমি। যাই হোক আত্মজীবনী শুনতে চাননি আপনি। বলছিলাম, বিপথ আমার ধর্ম। সোনাতে অল্প পরিশ্রমে বেশি লাভ, তাই এদিকে একটা সাইড্ বিজনেস খুলেছি। কিন্তু আমার আসল উদ্দেশ্য এটা নয়। আমি এক মহা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাই। বাছাই করা সব খারাপ লোক নিয়ে গড়ব আমি আমার এই আণ্ডারগ্রাউণ্ড সোসাইটি। টাকা আমার যথেষ্ট আছে, এবার আমি চাই ক্ষমতা অর্জন করতে । অপরাধ জগতে আমি সম্রাট হয়ে মরতে চাই। আমি সোনা চালান দিচ্ছি···।'

'কি ভাবে?'

হঠাৎ হেসে উঠল ওয়ালী আহমেদ। বেরিয়ে পড়ল এক সারি তরমুজের বিচি। শ্যাম্পেন শেষ হয়ে গিয়েছে—পান মুখে ফেলল সে আরেকটা । সেই সাথে জর্দা।

'আপনি দেখছি বাঁচার আশা ত্যাগ করেননি এখনও! ভাবছেন, আপনাকে হাতের মুঠোয় পেয়ে আমার গোপনতম কথা বলতে দ্বিধা করব না আমি ; আর চিরকাল যেমন হয়েছে, তেমনি দৈবক্রমে ছাড়া পেয়ে যাবেন আপনি। আর ছাড়া পেয়েই সমূলে ধ্বংস করে ফেলবেন আমাকে। তাই না? থ্রিল সিরিজের আইডিয়াল নায়ক। আমি আপনাকে এতটুকু আশ্বাস দিতে পারি, মিস্টার রানা, আমার হাত থেকে মুক্তি লাভ করা আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না। একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু তবু আমি একটি কথাও বলব না আপনাকে। আপনার লাশের কানে কানে হয়তো বলতে পারি, কিন্তু জ্যান্ত থাকতে এই গোপন কথা জানবার অধিকার নেই কারও।'

'তার মানে আপনার মনেও ভয় আছে যে চিরকাল যেমন হয়েছে, তেমনি এবারও আপনার হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে পারি আমি?'

'তা ঠিক নয়। সাবধানের মার নেই।'

এমন সময় টিপয়ের ওপর রাখা টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার কানে তুলে হুঁ-হাঁ করল ওয়ালী আহমেদ কিছুক্ষণ। কথা বলল না একটিও, শুনে গেল কেবল। খুশি খুশি হয়ে উঠল ওর চোখ-মুখ। বসন্তের বুটি-বুটি দাগ ভরা গাল দুটো কুঁচকে গেল মুচকি হাসিতে। নামিয়ে রেখে দিল সে রিসিভার।

'আমাকে না হয় হত্যা করবেন। মোহাম্মদ জান কি দোষটা করেছে? ওকে আটকে রেখেছেন কেন?' রানা বলল।

'ও-ই আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে এখানে।'

'মিথ্যে কথা। আমিই এনেছিলাম ওকে সাথে করে।'

'যাই হোক, যদি বুঝি তেমন কোনও ক্ষতি করতে পারবে না ও , তাহলে জানে মারব না। হালকা কোনও শাস্তি দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেব। আপাতত ক'দিন বন্দী থাকতে হবে ওকে।'

মেলা কথায় বিরক্ত হয়ে উঠছে রানা। সোজাসুজি জিজ্ঞেস করল, 'এখন আমাকে নিয়ে কি করতে চান, মি. ওয়ালী আহমেদ?'

'আপনাকে দিয়ে আমার দুটো উদ্দেশ্য আমি পূরণ করব। এক এক করে বলছি। প্রথমটা হচ্ছে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা। আপনি বোধহয় শুনেছেন জিনাতের কাছে, আমি কামনা করেছিলাম ওকে। আমাকে অবহেলা করে ও গিয়েছে আপনার কাছে। এর ফলে আমার আহত আত্মাভিমান অপমানে জর্জরিত হয়েছে। আমাকে বেকায়দায় ফেলে টাকা আদায় করে আপনারা যে প্রাণখোলা হাসি হেসেছিলেন, সে হাসি সূচের মত বিঁধেছে আমার মনে। প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলেছি আমি।'ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল ওয়ালী আহমেদের চেহারা। 'তাই আপনার চোখের সামনে টরচার করবে জিনাতকে আমার দেহরক্ষী গুংগা প্যাহেলওয়ান। মেয়েদেরকে নির্যাতন করার ব্যাপারে বরাবর আমার খুবই উৎসাহ আছে। পারভারটেড় বলতে পারেন—কিন্তু গুংগাকে আসরে নামিয়ে দিয়ে দর্শকের গ্যালারিতে বসে আমি যার-পর-নাই আনন্দ লাভ করি। আপনিও থাকবেন আমার সাথে আজ।'

'আজ?' চমকে উঠল রানা।

'হ্যাঁ। আজ। জিনাতকে আনতে পাঠিয়েছি। এসে পড়বে কিছুক্ষণের মধ্যেই।'

'অসম্ভব!'

'খুবই সম্ভব। নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।'

'জিনাত এখন তার বাপের বাড়িতে নিরাপদে আছে। ওকে রক্ষা করবার জন্যে যথেষ্ট সশস্ত্র লোক আছে ও বাড়িতে।'

'জানি। আমার ক্ষমতা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই আপনার—তাই আপনার এই সন্দেহ প্রকাশ করবার ধৃষ্টতা ক্ষমা করে দিচ্ছি। জিনাতকে ওই-বাড়ি থেকে বের করে আনা অত্যন্ত সহজ কাজ। মাত্র তিনজন লোক পাঠিয়েছি। সাথে নিয়ে গেছে একখানা বড় সাইজের রেডিওগ্রাম। কলিং বেল টিপলে বেরিয়ে আসবে বাইরে মোহাম্মদ জানের লোক। তাকে বলা হবে আগামী কাল জিনাত সুলতানার জন্মদিন উপলক্ষে ওটা মাসুদ রানার উপহার। কেউ কিছুমাত্র সন্দেহ করবে না। কাঠের ডালা তুলে দেখানো হবে অত্যন্ত দামী রেডিওগ্রামের কিছুটা অংশ। সাদরে ডেকে নিয়ে যাবে জিনাত ওদেরকে ওর ঘরে। রেডিওগ্রামটা পছন্দসই জায়গায় ফিট করে দেবে আমার লোক। তারপর ফেরার সময় সেই কাঠের বাক্সের মধ্যে করে নিয়ে আসবে জিনাতের জ্ঞানহীন দেহটা সবার সামনে দিয়ে। এবার বুঝেছেন?'

বিস্মিত দুই চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে রানা ওয়ালী আহমেদের মুখের দিকে। কয়েকটা খারাপ গালাগালি বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে। গালি শুনে তরমুজের বিচি বের করে হাসল ওয়ালী আহমেদ, গায়ে মাখল না। পায়ে বাঁধা ছুরিটার কথা মনে হলো রানার। কিন্তু না। এখন স্থির থাকতে হবে। এখনও সময় আছে।

'আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হলো দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন থেকে জোগাড় করা

আমার হাজার কয়েক প্রিয় মাছ বহুদিন মুখরোচক খাদ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে, ওদের একটু আনন্দ দান করা। নির্যাতনের পর জিনাতের দেহটা আপনার দেহের সঙ্গে একসাথে পেঁচিয়ে বেঁধে নামিয়ে দেয়া হবে পানিতে। আমি স্টপ-ওয়াচ নিয়ে থাকব কাছেই। ব্যাপারটা অনেকটা বৈজ্ঞানিক গবেষণার মত আর কি। এ ব্যাপারেও আমার উৎসাহের অভাব নেই। উজ্জ্বল বাতি থাকবে ট্যাঙ্কের ওপর। পরিষ্কার দেখা যাবে আপনাদের দেহ। আমার নিজের বিশ্বাস স্ত্রীলোকের চাইতে পুরুষের মাংসই ওরা বেশি পছন্দ করে। সেই পরীক্ষাও হয়ে যাবে এই ফাঁকে। তবে আমার স্থির বিশ্বাস কোনও অবস্থাতেই তিন মিনিটের বেশি সময় লাগবে না। সেটাও আজই বোঝা যাবে।'

'হাঙ্গর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আপনি একটা গর্দভ। হাজার হাজার হাঙ্গর পুষব কি করে আমি? এত খাবারই বা দেব কোত্থেকে? আর এজন্যে দক্ষিণ আমেরিকাতেই বা যাব কেন? এটা খুব ছোট মাছ। ছয় থেকে আট ইঞ্চি। শতখানেক এনেছিলাম শখ করে। এখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্রীড করিয়েছি। এখন আমার স্টকে আছে পনেরো হাজার।'

'পিরান্‌হা!' গলাটা শুকিয়ে এল রানার।

'ঠিক বলেছেন। পিরান্‌হা। ক্ষুরের মত ধারাল দাঁত দিয়ে পাঁচ মিনিটেই একটা আস্ত ঘোড়া খতম করে দেয় ঝাঁকের মধ্যে বাগে পেলে।'

দ্রুত চিন্তা করছে রানা। অসম্ভব। নিশ্চয়ই খামোকা ভয় দেখাবার জন্যে বোম্বাস্টিক গুল মারছে ওয়ালী আহমেদ। এক ধরনের ম্যানিয়াতে ভুগছে লোকটা। কিছুতেই এসব সত্যি হতে পারে না। এ হচ্ছে ওর বিকৃত মস্তিকের বিকারগ্রস্ত প্রলাপ। কিন্তু যদি সত্যি হয়···

'এবার আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে ক্ষমা করতে হবে, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনাকে এক্ষুণি 'টরচার চেম্বারে' নিয়ে যাবে গুংগা। অল্পক্ষণের মধ্যেই জিনাতও এসে পড়বে। আমি কিছু হাতের কাজ সেরেই আসছি।'

নিঃশব্দে আবার কিছু বলল ওয়ালী আহমেদ গুংগাকে। মাথা নাড়ল গুংগা। তারপর ইঙ্গিত করল রানাকে উঠে দাঁড়াবার জন্যে। বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। টেবিলের ওপর থেকে টাকা ও রুমাল তুলে আবার পকেটে চালান দিল রানা। তারপর উঠে দাঁড়াল বিনা বাক্যব্যয়ে। দেখল এখনও ওর দিকে ধরা আছে ওয়ালী আহমেদের হাতের পিস্তলটা। শেষ চেষ্টা একবার করতেই হবে—কিন্তু এখন নয়।

পিছন থেকে গুংগার হাতের মৃদু ঠেলা খেয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল রানা। আবার সেই চারফুটি এবং আটফুটি করিডর ধরে এগিয়ে গেল ওরা। শেডহীন বালবগুলোকে উলঙ্গ লাগল রানার কাছে। প্রতিধ্বনি উঠল ওর জুতোর শব্দের। এই গোলক ধাঁধার মত রাস্তায় উত্তর-দক্ষিণ পূব-পশ্চিম ঠিক রাখতে পারল না সে। এদিকটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার। আবছা অন্ধকারে একটা ঘরে চাবি লাগাল গুংগা। আর সেই সুযোগে আলগোছে পায়ে বাঁধা খাপ থেকে ছুরিটা বের করে পকেটে ফেলল রানা। ঝাঁপিয়ে পড়বে কিনা ভাবছিল, কিন্তু গুংগা ততক্ষণে আবার থাবা চালিয়েছে চুলের ওপর। রানা মনে মনে ভাবল, যত খারাপই দেখাক, এ-যাত্রা যদি রক্ষা পায় তাহলে ক্রু-কাট করে রাখবে মাথার চুল।

একটা সুন্দর ডাবলসাইজের খাট পাতা রয়েছে আলোকোজ্জ্বল ঘরটার এককোণে। দামী কাভারে ঢাকা। ওদিকে পাঁচ ছ'টা চেয়ার খাটের দিকে মুখ করা। একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল গুংগা রানাকে। হাতলের ওপর হাত রেখেই বুঝল সে, আলগা ওটা। জোরে হেঁচ্‌কা টান দিলে খুলে আসার সম্ভাবনা আছে। যদিও এই সামান্য অস্ত্র দিয়ে এই পাহাড়-প্রমাণ দৈত্যকে ঘায়েল করার চেষ্টা করা ছেলেমানুষী, কিন্তু এছাড়া উপায়ই বা কি? এরপর আর কোনও সুযোগ না-ও আসতে পারে।

এটাই তাহলে টরচার চেম্বার! কি পৈশাচিক বিকৃতি। এই দানব জিনাত সুলতানাকে নির্যাতন করবে, ছটফট্ করতে থাকবে নিরুপায় জিনাত রানার চোখের সামনে, চিন্তা করতেই রানার মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল। প্রাণ থাকতে এ দৃশ্য দেখতে পারবে না সে । তার আগে এর হাতে শেষ হয়ে যাওয়াও ভাল।

পিছন ফিরে বিছানার দিকে এগোচ্ছিল গুংগা। এক টানে মড়াৎ করে ভেঙে ফেলল রানা চেয়ারের হাতলটা। গুংগার কানে সে-শব্দ পৌঁছল না। কিন্তু পকেট থেকে ছুরি বের করে উঠে দাঁড়াতেই ঘরের মধ্যে যে সামান্য একটু আলো-ছায়ার পরিবর্তন হলো তাতেই বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়াল সে ।

মাঝপথে একবার ঝিক্ করে উঠল তীক্ষ্ণধার ছুরিটা।

দশ

ভয় কাকে বলে বুঝল মাসুদ রানা আজ। শুনেছে সে, প্রাণভয়ে কেউ দৌড় দিলে হানড্রেড মিটার স্প্রিন্টের রেকর্ড হোল্ডার ওয়ার্লড চ্যাম্পিয়ানও তার কাছে নস্যি। গল্পের বইয়ে পড়েছে প্রাণভয়ে ভীত মানুষ অদ্ভুত সব কাজ করে বসেছে : বারো ফুট উঁচু দেয়াল টপকে চলে গেছে ওপারে, বাঁকিয়ে ফেলেছে মোটা লোহার শিক। আজ বুঝল সে-কথার মধ্যে কিছুটা হলেও সত্যতা আছে, একেবারে গাঁজাখুরি নয়।

সোজা গিয়ে বিঁধল ছুরিটা গুংগার বুকে।

আশ্চর্য! আধ ইঞ্চিও ঢুকল না ছুরি ওর গায়ে। সামান্য একটু বিঁধে বাঁটটা ঝুলতে থাকল নাভির কাছে। এক মুহূর্ত সময় লাগল গুংগার বিস্ময় সামলাতে। কিন্তু তারই মধ্যে লাফ দিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে রানা। দড়াম করে লাগল চেয়ারের ভাঙা হাতলটা গুংগার নাক বরাবর। যত মুগুর পেটা শরীরই হোক না কেন, এই প্রচণ্ড আঘাতে নাকের জল আর চোখের জল এক হয়ে গেল গুংগার। হাত দিয়ে নাক ঢেকে ফেলায় মনে হলো দ্বিতীয় বাড়িটা পড়ল গিয়ে কাঠের ওপর। তৃতীয় বার আঘাতের চেষ্টা না করে খোলা দরজা দিয়ে ছুটল রানা। দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই পেছনে একটা ক্রুদ্ধ গর্জন শোনা গেল। ছুটতে ছুটতে একবার পিছন ফিরে চাইল রানা আস্ত একটা পাহাড় ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে ওর দিকে।

নিস্তার নেই, বুঝল রানা। ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুঁড়ে মারল হাতলটা। একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি যেন লাগল গিয়ে গুংগার গায়ে। ঠক্ করে উরুতে লেগে ছিট্‌কে চলে গেল হাতলটা একদিকে। গতি কমল না একটুও।

আবার ছুটল রানা। এঁকেবেঁকে এ-গলি ও-গলি, এ-বাঁক ও-বাঁক ঘুরে ছুটল

গুংগার কাছ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে। এই গোলক ধাঁধার কি শেষ নেই? পেছনে গুংগার ক্রুদ্ধ গর্জন। ব্লাড হাউণ্ডের মত গন্ধ শুঁকে এগিয়ে আসছে সে। হাত পা পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে কুঁকড়ে বসে পড়তে ইচ্ছে করল রানার।

একটা বাঁক ঘুরেই পর পর দুটো ঘরের দরজা খোলা, তারি পর্দা ঝুলছে। চট্ করে দ্বিতীয় ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল রানা। খালিঘর। পর্দাটা দুলছে, হাত দিয়ে ধরে স্থির করে দিল। তারপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকল ঘরের ভেতর।

সামনে দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল গুংগা। একটা দমকা হাওয়া পর্দা দুলিয়ে দিয়ে ঘরের ভেতর প্রবেশ করল। থপ্ থপ্ পায়ের শব্দ দূরে চলে গেল। রানা ভাবল, দৌড়ের ঝোঁকে কিছুদূর এইভাবে চলে যাবে গুংগা, কিন্তু ব্যাপারটা বুঝতে ওর বেশি দেরি হবে না। এক্ষুণি আবার ফিরে আসবে ও সামনে তাকে দেখতে না পেয়ে।

ঘরের চারদিকে চাইল রানা। কিছুই নেই যা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। অনেকগুলো শামুক স্তূপ করা আছে এককোণে, আর কয়েকটা ছোট ছোট জাল। আর কিছুই নেই ঘরটায়। হঠাৎ দরজার কোণে চৌকাঠের সঙ্গে ঝোলানো একটা লোহার রডের দিকে দৃষ্টি পড়ল রানার। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করবার হুড়কো, একদিক চৌকাঠের সাথে আটকানো। অসুরের শক্তি এসে গেল রানার দেহে দূর থেকে গুংগার থপ্ থপ্ পায়ের শব্দ ফিরে আসতে শুনে। দুই হ্যাঁচকা টানে খুলে এল রডটা কজা থেকে। অনেকটা কাছে এসে গেছে গুংগার পায়ের শব্দ। বেরিয়েই ছুট দিল রানা।

রানাকে দেখতে পেয়ে হুঙ্কার ছাড়ল গুংগা। তুফানের মত এগিয়ে আসছে এবার। বিশাল বুকটা শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে দ্রুত ওঠা-নামা করছে। বাঁক ঘুরতেই দেখল রানা একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল দু'জন লোক। বেরিয়েই রানা যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকেই রওনা হচ্ছিল ওরা, পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়াল। মরিয়া হয়ে এগোল রানা। প্রস্তুত হবার আগেই বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল সে লোক দুটোর ওপর। মাথার ওপর রডের বাড়ি খেয়েই 'ইয়াল্লা' বলে বসে পড়ল একজন। দ্বিতীয়জন ধরে ফেলল রডটা। প্রচণ্ড এক লাথি চালাল রানা ওর তলপেটে। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল শরীরটা। তারপর একটা নক্‌আউট পাঞ্চে ছিট্‌কে পড়ল দেয়ালের ওপর।

আর পনেরো হাত দূরে এখন গুংগা। আবার ছুটল রানা। অল্পদূর গিয়েই একটা বাঁক। বাঁকটা ঘুরেই আর না এগিয়ে বসে পড়ল সে মাটিতে। তারপর লোহার রডটা ওপাশের দেয়ালে নৌকার বৈঠার মত ঠেকিয়ে শক্ত করে ধরে বসে থাকল। উত্তেজনায় দাঁত বেরিয়ে গেছে রানার, ঠোঁটের দুই কোণ পিছিয়ে এসেছে কিছুটা।

তিন সেকেণ্ড পরেই তুফানের বেগে বাঁক ঘুরল গুংগা। রানাকে দেখতে পেল না। পা দিল সে রানার ফাঁদে সম্পূর্ণ অসতর্ক অবস্থায়। গুংগার পায়ের বাড়ি লেগে রানার হাত থেকে ছিটকে বহুদূরে চলে গেল রডটা। সেই সাথে দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল গুংগা। তুমুল গতিবেগ সামলাতে না পেরে উল্টে পাল্টে দেয়ালে ঠোকর খেয়ে বেশ খানিক দূরে গিয়ে থামল ওর দেহটা ঘাড় গুঁজে।

বুকের ভেতর একটা অদম্য আবেগ অনুভব করল রানা। জয়ের উল্লাসে চিৎকার

করে উঠতে ইচ্ছে করল ওর। পর-মুহূর্তেই শিউরে উঠল সে। প্রাণ উড়ে গেল ভয়ে। আশ্চর্য! আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে দানবটা!এই পতনের ফলে কিছুই হয়নি যেন ওর।

এইবার? আর রক্ষা নেই। খোদা! ধরা পড়তেই হলো!

হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটতে আরম্ভ করল রানা। পৌঁছল যে-ঘরটা থেকে লোক দু'জন বেরিয়েছিল, সেই ঘরের সামনে। ঘরে ঢুকেই বুঝল ওর আন্দাজটা ঠিক। চিনতে পারল ঘরটা। টিপে দিল বোতাম।

গুংগার ক্রুদ্ধ গর্জন কানে এল। দ্রুত ওপরে উঠে এল লিফট। এই পথ দিয়েই নামানো হয়েছিল ওদের। লাফিয়ে বেরিয়ে এল রানা লিফট থেকে।

দোকানটা খালি। থরে থরে সাজানো রয়েছে অ্যাকুয়ারিয়াম। নিশ্চিন্ত মনে তার মধ্যে খেলে বেড়াচ্ছে মাছগুলো। নিঃশব্দে। কোনও ভয় নেই, ভাবনা নেই। এত ঘটনার কোন খবরই রাখে না ওরা।

টেবিলের তলায় রানার ল্যুগারটা নেই। এখন? রানা লক্ষ করেছে, ও লিফট থেকে বেরোতেই আবার নিচে নেমে গিয়েছে লিফট। এখনই উঠে আসবে গুংগা। কোন্ দিকে যাবে সে এখন? দোকানের কোলাপসিবল গেট বাইরে থেকে নিশ্চয়ই তালা মারা। ওদিকে গিয়ে লাভ নেই। ছুটল রানা শো-রুমের দিকে। অ্যাকুয়ারিয়ামের ফাঁক দিয়ে এক ঝলক দেখা গেল গুংগার ভয়ঙ্কর মুখটা। ধক্ ধক্ করে জ্বলছে ওর ছোট ছোট চোখ দুটো। মুখটা কুঁচকে গেছে এক পৈশাচিক আক্রোশে। কালো পর্দা ছিঁড়ে ঢুকে পড়ল রানা শো-রুমের ভিতর।

কাঁচের ভিতর থেকে পরিষ্কার ফুটপাথ দেখতে পেল রানা। রাত কত হয়েছে? বারোটার বেশি নিশ্চয়ই নয়। এখনও হয়তো ট্যাক্সি পাওয়া যেতে পারে। ঝন্ ঝন্ করে ভেঙে পড়ল শো-রুমের কাঁচ রানার এক লাথিতে। লোহার ফ্রেম থেকে খানিকটা প্লাস্টার খসে পড়ল নিচে। এক লাফে বাইরে বেরিয়ে এল রানা। ভাঙা কাঁচের টুকরো লেগে কেটে গেছে কপাল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে,হাঁপাচ্ছে সে হাপরের মত। বাইরে ঠাণ্ডা বাতাসে বেরিয়ে এসে নতুন প্রাণশক্তি ফিরে পেল সে। ফুটপাথ ধরে ছুটল বাম দিকে।

গাড়ি আসছে না একটা? খুশি হয়ে উঠল রানার মন। যাক্ এ-যাত্রা বেঁচে গেল তাহলে। আধঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবে সে ফোর্স নিয়ে—বারোটা বাজাবে এদের হাতেনাতে ধরে।

একটা গাড়ি আসছে সামনে থেকে এই দিকে। কাছে এসে পড়েছে। রাস্তায় নেমে হাত দেখাল রানা।

ডাকাতের মত চেহারার একটা লোককে মাঝ রাত্তিরে এভাবে হাত তুলতে দেখে ভড়কে গেল ড্রাইভার। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ভোঁ করে বেরিয়ে গেল সে রানার পাশ দিয়ে বাউলি কেটে। অ্যাক্সিলারেটর পুরো টিপে ধরেছে সে। লাল রঙের একটা আমেরিকান গাড়ি।

অতি দুঃখেও হাসি পেল রানার। কিন্তু পরমুহূর্তেই মিলিয়ে গেল সে হাসি। পেছন ফিরে দেখল সে শো-রুমের ভাঙা কাঁচের মধ্যে দিয়ে ফুটপাথের ওপর বেরিয়ে এসেছে গুংগা।

আঁৎকে উঠে আবার ছুটল রানা। পেছনে গুংগা। আধ মিনিট ছুটবার পর পেছন

দিক থেকে জ্বলে উঠল আরেকটা গাড়ির হেড লাইট। গুংগার ছায়াটা বিকট দেখাচ্ছে সে আলোতে।

এই অবস্থায় গাড়িকে থামতে বললেও যে থামবে না, ভাল করেই জানা আছে রানার। তাই মিছে সময় নষ্ট না করে প্রাণপণে দৌড়ে চলল ও। টপ টপ ঘাম পড়ছে কালো পিচের রাস্তার ওপর। বিশ হাত পেছনে গুংগা। আর আধ মিনিটেই ধরা পড়ে যাবে রানা। কিন্তু যতক্ষণ দেহে শক্তি আছে, এগোতে হবে। আশ্চর্য! একটা পুলিস বা নাইট গার্ড নেই কেন! এতবড় একটা শহরের উন্মুক্ত রাজপথের ওপর খুন করা হচ্ছে ওকে, কারও কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাবে না সে?

রানার পাশ কাটিয়ে কয়েক হাত সামনে এগিয়েই হঠাৎ ব্রেক কষল গাড়িটা। ঝটাং করে খুলে গেল এদিকের দরজা।

'জলদি উঠে পড়ো, রানা! কুইক্!'

পরিষ্কার ইংরাজিতে বলল কেউ গাড়ির ভেতর থেকে। নারী কণ্ঠ। রানা দেখল সেই আমেরিকান গাড়িটা। বিস্মিত হবার সময় নেই। একলাফে উঠে পড়ল সে ড্রাইভারের পাশের সীটে। অনীতা গিলবার্ট। নিজেই ড্রাইভ করছে। আর কেউ নেই গাড়িতে।

ফার্স্ট গিয়ার দিল অনীতা। কিন্তু এক ইঞ্চিও এগোল না গাড়ি। চট করে রানা দেখে নিল হ্যাণ্ড ব্রেকটা তোলা আছে কিনা। না তো। লাফিয়ে সীট ডিঙিয়ে পেছনের সীটে চলে গেল সে। পেছনের কাঁচ দিয়ে দেখল, যা ভেবেছে তাই। পেছনের বাম্পার টেনে ধরে আছে গুংগা। দূরে রাস্তার ওপর চোখে পড়ল, চারজন লোক দৌড়ে আসছে এদিকে। ওদের লোক, সন্দেহ নেই।

'ব্যাক গিয়ার দাও, অনীতা। পেছন থেকে টেনে ধরেছে গুংগা। খানিকটা পিছিয়ে হ্যাঁচকা টান দিয়ে সামনে চালাতে হবে। পারবে না?'

'তোমার জন্যে সব পারব।'

অবাক চোখে চাইল রানা মেয়েটির দিকে। এই বিপদেও মাথা ঠাণ্ডা রেখেছে! অবলীলায় রসিকতা করছে। আশ্চর্য মেয়ে তো!

ততক্ষণে ব্যাক গিয়ার দিয়ে জোরে চালিয়ে দিয়েছে অনীতা পিছনে। খানিকটা পিছিয়েই এক ঝটকায় গুংগার হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল ওরা। পাঁচ সেকেণ্ডে স্পীড মিটারের কাঁটা উঠে গেল পঁচিশে, দশ সেকেণ্ডে পঁয়তাল্লিশ। মিলিয়ে গেল পিছনে গুংগার চেহারাটা দুঃস্বপ্নের মত।

হু-হু করে ছুটে চলেছে লাল গাড়িটা নির্জন রাস্তা দিয়ে। সামনে চলে এল রানা। ঠাণ্ডা হাওয়ায় অনেকখানি সুস্থ বোধ করল এবার। হেলান দিয়ে বসে সামনে যতদূর সম্ভব পা ছড়িয়ে দিল।

'তুমি হঠাৎ কোত্থেকে, অনীতা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার এক বোনকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে ফিরছিলাম। সিনেমা স্টার। লাহোর যাচ্ছে। ওরই গাড়ি। তুমি তো প্রথমে আমাকে ভয় লাগিয়ে দিয়েছিলে একেবারে। পাশ কাটিয়ে ভেগেছিলাম ডাকাত মনে করে। চেনা চেনা লাগছিল, কিন্তু একটু দূরেই যখন গুংগাকে দেখলাম, তখনই বুঝলাম লোকটা তুমি ছাড়া কেউ না। তারপর গাড়ি ঘুরিয়ে আবার এলাম ছুটে।'

'তোমার সাহস আছে বলতে হবে।'

'সাহস দেখাবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছি আমি। প্রশংসা করে লজ্জা দেবার চেষ্টা কোরো না। এখানে কি করছিলে শুনি? অবস্থা তো রীতিমত সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল দেখলাম। রেল এঞ্জিনের মত ফোঁস ফোঁস করছিলে গাড়িতে উঠে। ব্যাপার কি? রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাচ্ছিলে মনে হলো? না, না, এক্ষুণি উত্তর দেয়ার দরকার নেই। আগে বিশ্রাম নিয়ে নাও।'

দপ্ দপ্ করছে রানার কপালের দু'পাশে শিরাগুলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকল সে। আর কান খালি পেয়ে অনর্গল বক বক করতে থাকল অনীতা গিলবার্ট।

'আজই ছুটেছিলে বুঝি প্রতিশোধ নিতে? তুমি দেখছি একেবারে সিনেমার হিরোর মত শিভালরাস্ হয়ে উঠেছ। ভাবছি তোমার প্রেমেই পড়ে যাব কিনা। একে হ্যাণ্ডসাম্, তার ওপর নারীত্রাতা! রক্ষে আছে আর? কিন্তু দেখো তো, কি বিপদে ফেললাম তোমাকে গায়ে পড়ে সাহায্য চেয়ে! তোমার জন্যেই তো। আমার চাকরিটা ঘুচিয়ে না দিলে আমিই প্রতিশোধ নিতাম সুযোগ মত—তোমার কাছে নাকি-কান্না কাঁদতে যেতাম না। আহা, হিরো বেচারা হাঁপাচ্ছে দেখো!'

হেসে উঠল অনীতা খিল খিল করে। লাইট পোস্টের আলোয় ঝিক করে উঠল সোনা বাঁধানো একটা দাঁত। একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সিগারেট খাও না?'

'খেতাম, ছেড়ে দিয়েছি,' জবাব দিল রানা।

'তাহলে যাও, আমিও ছেড়ে দিলাম,' বলেই ফেলে দিল হাতের সিগারেট।

'এখন যাচ্ছ কোন্‌দিকে, অনীতা? কাছাকাছি কোনও ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ড পাওয়া যাবে না?'

'তুমি যাবে কোথায়? হোটেলে?'

'না। আমার এখন অনেক কাজ পড়ে আছে। এক্ষুণি কয়েক জায়গায় ফোন করা দরকার। তারপর যেতে হবে নাজিমাবাদ। তুমি আমাকে যে কোনও ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে যাও।'

'গাড়িটা হপ্তাখানেক আমার অধীনে থাকছে। এটাকে ট্যাক্সি হিসেবে ব্যবহার করো না এই ক'দিন? আর আমিও গায়ে-পড়া বেহায়া মেয়েলোক—হিরোর সান্নিধ্য লাভ করে ধন্য হই।'

হাসল রানা। মেয়েটির বলিষ্ঠ মানসিকতা মুগ্ধ করতে আরম্ভ করেছে ওকে। অদ্ভুত সহজ, সাবলীল, স্বচ্ছন্দ অনীতার কথাবার্তা, চালচলন, দৃষ্টিভঙ্গি। কোথাও কোনও আড়ষ্টতা নেই, জটিলতা নেই।

'বেশ। সাতদিন বেঁচে থাকব কিনা কে জানে। আর সাতদিনের মধ্যে আমাকে কোথায় যে ড্রাইভ করে নিয়ে যাবে তুমি তারও ঠিক নেই। তবু অ্যাপয়েন্ট করলাম তোমাকে। আজ আমাকে নাজিমাবাদে নামিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে যাও। কাল বিকেলে এসো হোটেলে। রোজকার মজুরি রোজ। আজকের মজুরি হিসেবে গত দু'দিনের সব ঘটনা সংক্ষেপে বলছি তোমাকে। রাজি?'

'রাজি।'

গল্প শেষ হতেই পৌঁছে গেল ওরা নাজিমাবাদ। বাড়িটা অন্ধকার। কোথাও

কোন আলো নেই দেখে মনটা দমে গেল রানার। অনীতাকে বিদায় দিয়ে কলিং বেল টিপল সে। মিনিট দু'য়েক পর চোখ ডলতে ডলতে বেরিয়ে এল সাঈদ খান।

'চাচাজী কোথায়?' রানাকে একা দেখে জিজ্ঞেস করল সাঈদ। 'গাড়িটাও দেখছি না যে?'

'জিনাত কোথায়?' পাল্টা জিজ্ঞেস করল রানা।

'কেন, ঘুমাচ্ছে ওর ঘরে!' রানার কপালে কাটা দাগ দেখে ঘুমের রেশ কেটে গেল ওর।

'কেউ এসেছিল রেডিওগ্রাম নিয়ে?'

'হ্যাঁ। আপনি পাঠিয়েছিলেন তো? সে তো প্রায় ঘণ্টাখানেক আগেই দিয়ে গেছে। কিন্তু চাচাজী কোথায়?'

'সর্বনাশ হয়ে গেছে, সাঈদ। জিনাতের ঘরটা কোনদিকে?'

সাঈদকে ঠেলে ঢুকে পড়ল রানা ঘরে মধ্যে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সাঈদও এল পিছু পিছু। বলল, 'দোতলায় উঠেই প্রথম ঘরটা। কেন, কি ব্যাপার?'

তিন লাফে দোতলায় উঠে এল রানা। ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা। বাতি জ্বালতেই চোখ পড়ল চমৎকার একখানা রেডিওগ্রামের ওপর। স্টিরিওফোনিক। দাম সাত-আট হাজার টাকার কম হবে না।

কেউ নেই ঘরে। ঘর খালি। বিছানার চাদরে ভাঁজ পড়েনি একটুও। অর্থাৎ কেউ শোয়নি আজ ওই বিছানায়। বাথরুমে খোঁজ করা নিরর্থক, যা বোঝার বুঝে নিয়েছে রানা; তবু একবার দেখে এল সে। সাঈদও এসে দাঁড়িয়েছে ঘরের মধ্যে। একদম বোকা বনে গেছে সে। কিছুই বুঝতে পারছে না। জিনাত গেল কোথায়? তার সাথে রেডিওগ্রামের কি সম্পর্ক? রানাই বা এত রাতে একা এসে হাজির হলো কোত্থেকে? চাচাজী কোথায়? সব প্রশ্ন একসাথে ভিড় করে আসে ওর মনের মধ্যে।

'ব্যাপারটা একটু খুলে বলুন, মিস্টার রানা।'

'বলছি। তার আগে একটা ফোন করা দরকার। আপনি ছুটে গিয়ে গ্যারেজ থেকে জিপটা বের করুন।'

সাঈদ বুঝল জরুরী ব্যাপার। ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল সে।

একতলার বৈঠকখানায় গিয়ে বসল রানা ফোনের সামনে। একটা সিক্স ডিজিট্ নাম্বারে ডায়াল করল।

'আমি মাসুদ রানা বলছি।...এক্ষুণি পঞ্চাশ জনের আর্মড্ মিলিটারি ফোর্স পাঠাবার ব্যবস্থা করুন এই ঠিকানায়। পেন্সিল নিয়েছেন? লিখুন Fish Emporium, 234 Victoria Road. স্টেনগান আর টর্চ নিলেই চলবে। আমিও আসছি ওখানে। পুরো বিল্ডিংটা ঘিরে ফেলতে বলবেন। আমি এসে বাকি ব্যবস্থা করব। একটি প্রাণীও যেন বেরুতে না পারে। আমার কোড নাম্বার হচ্ছে এম আর নাইন। ঠিক আছে?'

সাঈদ এসে ঢুকল ঘরে। ফোনটা নামিয়ে রেখে রানা বলল, 'চলুন। গাড়িতেই সব কথা বলব।'

'এক সেকেণ্ড কাপড় পরে আসছি আমি।'

'আমার জন্যে একটা এক্সট্রা রিভলভার আনবেন সাথে করে। আমারটা খোয়া গেছে।'

'আরও লোক নেব?'

'না। দরকার হবে না।'

পথে সমস্ত ঘটনা শুনে পাথরের মত স্থির হয়ে গেল সাঈদ খান। তারই চোখের সামনে দিয়ে জিনাতকে ধরে নিয়ে গেল দুর্বৃত্তেরা, সে কিছুই করতে পারল না! চাচাজীকে কি উত্তর দেবে সে? জিনার কাছেই বা মুখ দেখাবে কি করে? ক্ষোভে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে ওর।

এগারো

ছটফট করছে রানা খাঁচায় বন্দী বাঘের মত।

নিরাশ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে ওকে। একটি প্রাণীরও চিহ্ন পাওয়া যায়নি ফিশ এম্পোরিয়ামে। সব পালিয়েছে। অ্যাকুয়ারিয়াম আছে, মাছও আছে যেমন ছিল ঠিক তেমনি। শুধু মানুষগুলো সব ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রত্যেকটা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছু পাওয়া যায়নি। পাহারা বসিয়ে দিয়ে রাত দুটোর সময় হোটেলে ফিরে এসেছে সে।

এখন কিছুই করবার নেই ওর, সব রকম খবরাখবর নেয়া হয়েছে ওয়ালী আহমেদের সম্পর্কে—সমস্ত সম্ভাব্য জায়গায় খোঁজা হচ্ছে তাকে। রাওয়ালপিণ্ডিতে বেতারে খবর চলে গেছে। ওয়ালী আহমেদের ছদ্মবেশী অনুচরকে (যে পি. আই. এ. করে সন্ধ্যার ফ্লাইটে রওনা হয়েছিল) সম্ভব হলে গ্রেপ্তার করার জন্যে।

কিন্তু বুঝতে পারছে রানা, আজই এক্ষুণি যদি ওয়ালী আহমেদের ওপর চরম আঘাত হানতে পারা না যায় তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে জিনাতের। কিন্তু কোথায় আঘাত করবে? শত্রুর চিহ্নই নেই যে মোকাবিলা করবে। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন সবাই ভোজবাজির মত। জিনাত এবং মোহাম্মদ জানেরও কোনও খবর নেই সেই সাথে।

ঘরের মধ্যে বহুক্ষণ পায়চারি করল রানা। এই নিরুপায় অবস্থায় নিষ্ফল আক্রোশে গজরাতে থাকল সে। সব রাগ কেন জানি গিয়ে পড়ল নিজেরই ওপর। সে-ই এদেরকে টেনে এনেছে এই বিপদের মধ্যে। কেন সে পারছে না? কেন সে পারছে না জিনাতকে রক্ষা করতে, মোহাম্মদ জানকে মুক্ত করে আনতে? তারই জন্যে তো আজ ওদের এই অবস্থা।

ঘণ্টাখানেক এভাবে পায়চারি করার পর স্থির হলো রানা অনেকখানি। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। হু-হু করে বাতাস আসছে সাগর থেকে। সমুদ্রের গর্জনে জিনাতের কান্না।

রানা বুঝল, যা হবার হয়ে গেছে। এখন আপাতত ওর নিজের পরিশ্রান্ত দেহটাকে বিশ্রাম দেয়া ছাড়া আর কিছুই করবার নেই। কাল নব উদ্যমে এগোতে হবে নতুন পথে। বিশ্রামটা প্রয়োজন। এরকম অস্থির ভাবে সারারাত পায়চারি করে

বেড়ালে নিজেকে আরও দুর্বল করে ফেলা ছাড়া আর কোনও লাভ হচ্ছে না।

ঘরে এসে দুটো স্লীপিং পিল খেয়ে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল রানা বাতি নিভিয়ে। অনেকক্ষণ ছটফট করল বিছানায় শুয়ে, এপাশ ওপাশ ফিরল কমপক্ষে পঞ্চাশবার। ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়ল সে। পাতলা একটা তন্দ্রার ঘোর নামল দু'চোখে।

ভয়ঙ্কর একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল রানার। রিস্টওয়াচে দেখল পাঁচটা বাজে। সারা শরীর ঘেমে নেয়ে উঠেছে। টিপয়ের ওপর রাখা কাঁচের জার থেকে ঢেলে এক্গ্লাস ঠাণ্ডা পানি খেলো সে। স্বপ্নের ঘোরটা কাটেনি।

ভাবল, ওয়ালী আহমেদের কথাগুলো অতিরিক্ত রেখাপাত করেছিল মনের ওপর, তাই বোধহয় এ দুঃস্বপ্নটা দেখল সে। স্বপ্নের ঘটনাস্থল হচ্ছে 'টরচার-চেম্বার'। কিন্তু ফিশ্ এম্পোরিয়ামের সমস্ত চেম্বারই এখন মিলিটারির দখলে। কাজেই ঘটনাটা তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করল সে মন থেকে। আবার ভাবল, ওই ঘরটা ও দেখেছে বলে ওটারই স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু করাচি শহরের অন্য কোনও একটা ঘরে ঘটনাটা ঘটা কি একেবারেই অসম্ভব?

উঠে বসল রানা বিছানার ওপর। ভোর রাতের স্বপ্ন নাকি ফলে। এতদিন কথাটা হেসে উড়িয়ে দিলেও আজ কেন জানি মনটা এই কুসংস্কারের প্রতি বিদ্রূপ করতে পারল না।

দর্শকের গ্যালারিতে বসে আছে ওয়ালী আহমেদ। তার পাশে যেখানে রানার বসবার কথা ছিল সেখানে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসানো হয়েছে মোহাম্মদ জানকে।

জিনার তীক্ষ্ণ দীর্ঘস্থায়ী চিৎকারে ঘুম ভেঙে গিয়েছে রানার। জেগে উঠেও কিছুক্ষণ শুনতে পেয়েছে সে চিৎকার। একটু পরেই ভুল ভাঙল। দূর থেকে ভেসে আসছে জাহাজের বাঁশী।

কিন্তু জিনাতের বেদনা-কাতর মুখটা কিছুতেই ভুলতে পারল না রানা। উঠে গিয়ে বাথরুম থেকে চোখে-মুখে পানি ছিটিয়ে এসে আবার বিছানায় উঠতে যাবে, এমন সময় খুট্ করে দরজায় শব্দ হলো একটা।

মনের ভুল ভেবে শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কিন্তু আবার খুট করে শব্দ হতেই লাফিয়ে উঠে বসল রানা। না, মনের ভুল নয়। রিভলভারটা বের করল সে বালিশের তলা থেকে। করিডরে কয়েকটা দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল। পা টিপে এসে দাঁড়াল সে দরজার পাশে। দশ সেকেণ্ড কান পেতে থেকেও আর কোনও শব্দ শুনতে পেল না সে।

নিঃশব্দে বল্টু খুলে এক ঝটকায় দরজা খুলে বাইরে চাইল সে। হাতে উদ্যত রিভলভার। করিডরটায় কম পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। হলদে ম্লান আলো। কই, কেউ তো নেই। মানুষ দেখতে পাবে বলে উঁচুতে চেয়েছিল রানা, চোখ নামাতেই দেখতে পেল জিনিসটা। দরজার সামনে রাখা আছে একটা লম্বা কাঠের বাক্স। দুই বাই দেড় বাই ছয় ফুট সাইজ। ওপরে বড় বড় করে লেখা: GRUNDIG.

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল রানার। তবে কি…!

দুটো পেরেক মেরে ডালা আটকানো। ঘরে বাতি জ্বেলে ঠেলে নিয়ে এল রানা

বাক্সটা ঘরের ভেতর। ভারি। রক্তের একটা ধারা এল দরজা দিয়ে ঘরের মাঝখান পর্যন্ত। রক্ত কেন? ডালা ধরে টান দিতেই খুলে এল সেটা। ভেতরে চেয়েই চক্ষুস্থির হয়ে গেল রানার। যা ভেবেছিল তাই। ভেতরে শোয়ানো আছে একটা মানুষের দেহ। সারা দেহে ব্যাণ্ডেজ জড়ানো। রক্তে ভেজা লাল। মৃতদেহ কারও? কার? জিনাত—না মোহাম্মদ জান?

খাবলা খাবলা করে সারা মুখের মাংস খাওয়া—চোখের কোটর দেখা যাচ্ছে, চোখ নেই। নাকের সামনের অংশটুকু নেই। একটু নড়ল মনে হলো না?

দেহটা তুলে নিয়ে বিছানায় শোয়াল রানা। খান মোহাম্মদ জান! বুকের ওপর কান রেখে দুর্বল হার্ট বিট শুনতে পেল রানা। কয়েক পরতা ব্যাণ্ডেজ খুলে দেখল সারা দেহই মুখের মত খাবলে খাওয়া। বাঁচানো যাবে না। জ্ঞান আছে কিনা দেখার জন্যে ডাকল রানা একবার নাম ধরে।

হঠাৎ নড়ে উঠল খান মোহাম্মদ জানের মুমূর্ষু দেহটা।

'কে, মেজর?' দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল মোহাম্মদ জান। গলার ভেতর তার আসন্ন মৃত্যুর ঘড়ঘড় শব্দ। এ শব্দ রানা চেনে। এটা মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ।

'হ্যাঁ! মাসুদ রানা, সর্দার!' ব্যগ্র কণ্ঠে বলল রানা।

'তোমার জন্যেই এখনও বেঁচে আছি আমি, রানা। জ্ঞান হারাইনি।'

'এ অবস্থা কি করে হলো আপনার?'

এই কথার উত্তর দিল না মোহাম্মদ জান। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে শেষ কথা বলার জন্যে শক্তি সঞ্চয় করল। তারপর ফিশ ফিশ করে বলল, 'প্রতিশোধ! প্রতিশোধ নিয়ো, রানা!'

'ঠিকানা বলতে পারবেন?'

'জিনাতকে···জিনাতকে ওরা—'

'আমি জানি সে কথা। ঠিকানা। ঠিকানাটা বলুন!' মুখের কাছে কান নিয়ে গেল রানা। কিন্তু কথা আটকে গেল মোহাম্মদ জানের। উত্তর দিতে পারল না। মুখ দিয়ে ভুড়ভুড়ির মত গ্যাজলা বেরোল খানিকটা। কেঁপে উঠল শরীরটা দু'বার। তারপর স্থির হয়ে গেল। রানা বুঝল, সব শেষ।

টেলিফোন রিসিভারটা তুলে নিল সে। কয়েকবার রিং হতেই ওপাশে রিসিভার তুলল সাঈদ খান।

'সাঈদ?'

'জ্বী, হাঁ।'

'শিগ্‌গির চলে আসুন হোটেলে। আমি রানা বলছি।'

'এক্ষুণি আসতে হবে?'

'হ্যাঁ। এক্ষুণি।'

'কোনও খবর পেলেন? নতুন কিছু?'

'দুঃসংবাদ আছে। আসুন তারপর বলব।'

আর কোনও কথা না বলে ফোন নামিয়ে রাখল সাঈদ। এবারে আবার সেই ছয় ডিজিটের বিশেষ নাম্বারে ডায়াল করল রানা। মোহাম্মদ জানের খবর দিল এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবার নির্দেশ দিল। তারপর বিছানার কাছে এসে বসল

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে।

হঠাৎ কাগজটা চোখে পড়ল রানার। বুকের কাছে ব্যাণ্ডেজের মধ্যে গোঁজা। বের করে নিয়ে চোখের সামনে ধরল সে কাগজটা। অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল ওটার দিকে কিছুক্ষণ। বুঝতে পারল না কিছুই। তীব্র উত্তেজনায় এক মুহূর্তের জন্যে ব্ল্যাক আউট হলো যেন রানার দৃষ্টি। পর মুহূর্তেই ফুটে উঠল লেখাগুলো স্পষ্ট। ইংরাজিতে টাইপ করা। বাংলা করলে দাঁড়ায়:

মাসুদ রানা,

তোমার জন্যও এই একই দণ্ডাদেশ।

অপেক্ষা করো।

ধক্-ধক্ করে জ্বলল রানার চোখ কয়েক সেকেণ্ড। কঠোর হয়ে গেল মুখটা। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে স্থির করবার চেষ্টা করল সে। তারপর খান মোহাম্মদ জানের মৃতদেহের মাথায় রাখল ডান হাত। বলল, 'প্রতিজ্ঞা করলাম, সর্দার। প্রতিশোধ নেব।'

কথাটা বলেই রানা লক্ষ করল মোহাম্মদ জানের চুল ভেজা। পিরানহার ট্যাঙ্কে ফেলে হত্যা করা হয়েছে তাকে। কি মনে করে কয়েকটা চুল ছিঁড়ে নিল রানা লাশটার মাথা থেকে। চেটে দেখল, নোনতা। চট্ করে একটা কথা মনে পড়ল ওর। তাহলে কি···

ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ফর্সা হয়ে আসছে আকাশটা। সাগর থেকে আসা ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া বয়ে আনছে সমুদ্রের কল্লোলধ্বনি। দূর থেকে আবার ভেসে এল জাহাজের বাঁশীর করুণ সুর।

সাঈদ পৌঁছল প্রথম। ছুটে গেল বিছানার পাশে। দুই হাতে মুখ ঢেকে হু-হু করে কেঁদে উঠল। একটু পরেই সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। শার্টের আস্তিনে চোখ মুছে নিয়ে ফিরল রানার দিকে।

'চাচার খুনের বদলা নেব আমি।'

'আমিও।'

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানা ওর চোখের দিকে। ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল সাঈদ। রানাও চেপে ধরল ওর হাত। দুইজন শক্তিশালী পুরুষের মৈত্রী-স্থাপন হলো।

'আজ সন্ধ্যায় এসো। একা।'

'আচ্ছা।'

চোখে চোখে কথা হয়ে গেল দু'জনের।

এরপর বাকি সব রুটিন মাফিক হয়ে গেল। ডাক্তার পরীক্ষা করে রায় দিল। অ্যাম্বুলেন্সে করে লাশ চলে গেল মর্গে। পোস্টমর্টেম হবে। সাঈদ চলে গেল সেই সঙ্গে। ঘর খালি হতেই আবার কাগজের টুকরোটা বের করল রানা। মোহাম্মদ জানের রক্ত লেগে আছে এক কোণে। উল্টোপিঠে আঠা লাগানো—মাছের অ্যাকুয়ারিয়ামে লাগাবার লেবেল। বুক পকেটে রেখে দিল সে চিঠিটা। ফরাস এসে চাদর বদলে দিয়ে গেল বিছানার।

বাইরের ঘরে সোফার ওপর হেলান দিয়ে বসে চোখ বন্ধ করল রানা। গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে সে। ছোট্ট দু'একটা সূত্র ধরে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার চেষ্টা করছে

সে। সমস্ত মনোযোগ একত্রীভূত হওয়ায় দুই ভুরুর মাঝখানে কপাল খানিকটা ফুলে উঠেছে। স্থির হয়ে পড়ে থাকল সে বিশ মিনিট, তারপর চোখ মেলল। সমাধান হয়ে গেছে সমস্যার।

কয়েকটা জায়গায় টেলিফোন করে কিছু নির্দেশ দিল সে। কিছু খবরও সংগ্রহ করল। সারাদিন ঘর থেকে বেরোল না।

চারটের সময় দুটো থারটি-ও-সিক্স রাইফেল এবং আরও কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস পৌঁছে দেয়া হলো রানার কামরায় পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট মারফত, গোপনে। প্রতিটা রাইফেলের জন্যে একটা করে পাঁচ-গুলির এক্সট্রা ম্যাগাজিন। মেশিন রেস্টে জিরোয়িং করা আছে রাইফেলগুলো এক্সপার্টের হাতে। একটা টারগেটে পাঁচটা গুলির গ্রুপিং দেখানো আছে—স্লিং-এর সঙ্গে টুইন সুতো দিয়ে বাঁধা। গ্রুপিং দেখে খুশি হলো রানা। টু হানড্রেড ইয়ার্ডসে তিনটে বুলস্ আই। সোয়া ইঞ্চি গ্রুপিং।

রানার নির্দেশে সাগর পারের একটা গোডাউন খুঁজে বের করেছে সাধু বাবাজী। বিভিন্ন রকমের ব্যবসা আছে এই কোম্পানীর। একটা ইয়ট আছে, করাচি-চিটাগাং যাতায়াত করে মাসে একবার করে। হরেক রকম মাল নিয়ে যায় এখান থেকে চিটাগাং-এ। সাথে ঝিনুক, শঙ্খ এবং নানান জাতের সৌখিন রঙিন মাছও যায়। আর যায় কলেজ-ইউনিভারসিটিতে রিসার্চের জন্যে এবং যারা মাছ পোষে তাদের কাছে বিক্রির জন্যে নানান রকম বিষাক্ত সামুদ্রিক সাপ ও মাছ। ফেরার সময় আদা আর বেতের কাজ করা কুটির শিল্পের বিভিন্ন শখের জিনিস নিয়ে ফেরে করাচিতে। এ ছাড়া এক্সপোর্টও করে এই কোম্পানী বিরাট স্কেলে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী। পুলিসের কোনও খারাপ রিপোর্ট নেই। কাস্টমসেও অল ক্লিয়ার। পরিষ্কার ঝরঝরে ব্যবসা। বছর দু'য়েক হলো শুরু করেছে—বেশ জমিয়ে নিয়েছে এরই মধ্যে। ম্যানেজিং ডিরেক্টর নাজির বেগ।

রাইফেল দুটো ভালমত পরীক্ষা করে দেখল রানা বোল্ট টেনে। সব ঠিক আছে। এখন রাতের অপেক্ষা। একাই যেত সে, কিন্তু সাঈদকে সাথে না নিলে অন্যায় করা হবে ওর প্রতি। ওরও আছে প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার।

গোপনে যেতে হবে। রানা মনে মনে জানে, দল নিয়ে গেলেও চলত; কিন্তু তাহলে প্রতিশোধটা নেয়া হয় না। ওদের বুঝিয়েছে মিলিটারি বা পুলিস মুভমেন্ট টের পেলেই পালিয়ে যাবে সে নাগালের বাইরে। তাছাড়া মাছের ব্যবসার সঙ্গে সোনা চোরাচালানের সম্পর্ক বের করা যায়নি এখনও। ছোট ছোট মাছ, বড় নয় যে পেটের মধ্যে করে সোনা চালান দেয়া যেতে পারে।

বিকেলে করাচি ব্রাঞ্চ থেকে এল দু'জন। রানার বর্তমান কার্যকলাপ আবছা ঠেকছে করাচি অফিসের কাছে। অথচ রানার নিরাপত্তার দায়িত্ব ওদেরই ওপর। রানার ভবিষ্যৎ প্ল্যান জানতে চাইল ওরা। এড়িয়ে গেল রানা। কারণ, ঠিক কোন্ লোকটা বোঝা না গেলেও করাচি অফিসে অন্তত একজন দু'মুখো সাপ আছে। তা না হলে এত সহজে রানাকে চিনে বের করা সম্ভব হত না মোহাম্মদ জান বা ওয়ালী আহমেদের পক্ষে।

'সবকিছু এমন রহস্যাবৃত রাখার কারণ জানতে পারি?' একজন প্রশ্ন করল।

'হেড অফিস থেকে সেটা জানতে পারবেন।'

'এটা কি আমাদের ওপর আপনার কনফিডেন্সের অভাব বলে ধরে নেব?'

'সেটাও হেড অফিস থেকেই জানতে পারবেন।'

'আমাদের চীফ আপনার কার্যকলাপে অত্যন্ত—'

'দেখুন,' উঠে দাঁড়াল রানা সোফা ছেড়ে। 'আপনার চীফের বিরক্তি বা ঘৃণা যা-ই থাকুক, হেড অফিসে জানাতে বলবেন। এ কাজের ভার ডিরেক্ট হেড অফিস থেকে পেয়েছি আমি। আপনার হেডের কাছে যে ইনস্ট্রাকশন এসেছে সেটা যদি তিনি ভুলে গিয়ে থাকেন তাহলে আবার তাঁকে ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলবেন। এই কেসে আমি যেটুকু সাহায্য চাইব সেটুকু সাহায্য করতে তিনি বাধ্য—তার বেশি একটি কথাও জানবার তাঁর অধিকার নেই। আপনারা এবারে আসতে পারেন।'

'একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন, মিস্টার মাসুদ রানা। আপনার রিপোর্ট করাচি চীফের কাছে দেয়ার কথা। এখান থেকে ঢাকায় রীলে করা হবে সেটা। কিন্তু···'

'আমার রিপোর্ট আমি সরাসরি হেড অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

বেরিয়ে যাচ্ছিল ওরা। রানা আবার বলল, 'আমারই রিসিভ করার কথা ছিল, কিন্তু আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। আপনার চীফকে বলবেন আজ রাতের ফ্লাইটে আসছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান কাউকে কিছু না জানিয়ে। ইচ্ছে করলে এয়ারপোর্টে গিয়ে রিসিভ করতে পারেন।'

বেরিয়ে গেল ওরা। সেই সাথে রানার মেজাজটাও বিগড়ে দিয়ে গেল। সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। ঠিকই করেছে সে আচ্ছামত ডাঁটিয়ে দিয়ে। রানার ভদ্রতার সুযোগ গ্রহণ করতে চাইছিল ব্যাটারা। সীমা লঙ্ঘনকারীকে প্রয়োজন হলে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয় তার সীমাবদ্ধতা।

মিনিট পনেরো পরেই ঘরে ঢুকল অনীতা গিলবার্ট।

'হ্যালো, হিরো! এখনও বেঁচে আছ তাহলে?'

'ভয়ে ঘর থেকে বেরোইনি সারাদিন,' মৃদু হেসে বলল রানা।

'উঁহু। বিশ্বাস করলাম না। ভয়ে পেছপা হবার লোক আলাদা। তোমার চেহারায় সংকল্প দেখতে পাচ্ছি, বন্ধু। ব্যাপার কি? আরও ঘটেছে কিছু?'

মাথা নাড়ল রানা। কফির অর্ডার দিয়ে মোহাম্মদ জানের পরিণতির কথা বলল অনীতাকে। সাঈদের কাছে জিনাতের পরিণতির কথা গোপন করেছিল। কিন্তু অনীতাকে বলল সব। ভুরু কুঁচকে গেল অনীতার।

'এখনও চুপচাপ বসে আছ?'

'এখনও আছি। কিন্তু সন্ধের পর আর থাকব না।'

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে।'

'অসম্ভব। মেয়েমানুষের কাজ এটা নয়।'

'আমারও প্রতিশোধ নেবার আছে।'

'সেদিক থেকে অবশ্য সাঈদের মত তোমারও দাবি আছে। কিন্তু তোমাকে সাথে নিলে কাজে অসুবিধে হবে। অবশ্য অন্য কাজ দিতে পারি তোমাকে।'

'কি কাজ?'

'ঠিক রাত এগারোটার সময় সাগর পারের একটা স্টোর রুমের সামনের রাস্তায় ওই লাল গাড়িটা নিয়ে উপস্থিত হবে। গাড়ির এঞ্জিন বন্ধ করবে না। বারোটার মধ্যে যদি আমার দেখা না পাও তাহলে একটা বিশেষ নম্বরে ফোন করে খবরটা শুধু জানিয়ে দেবে। পারবে না?'

'খুব পারব। ঠিকানা আর ফোন নম্বর লিখে দাও। ঠিক সময় মত পাবে আমাকে।'

এক টুকরো কাগজে লিখে দিল রানা ফোন নাম্বার ও ঠিকানাটা। ভ্যানিটি ব্যাগে রেখে দিল সেটা অনীতা। একটা লজেন্স মুখে পুরল কফির কাপ শেষ করে। সত্যিই ছেড়ে দিয়েছে সিগারেট। রাইফেল দুটো দেখে চোখমুখের একটা ভঙ্গি করল।

'যুদ্ধ হবে মনে হচ্ছে!'

মুচকে হাসল রানা। মেয়েটির কথা বলার ভঙ্গিতে কৌতুক আর বুদ্ধির ছটা। এমন অঙ্গভঙ্গি করে কথা বলে যে না হেসে পারা যায় না। সাধারণ কথা, তবু হাসি আসে। চলে গেল সে টাটা করে।

সন্ধের পর এল সাঈদ খান।

'হোটেল থেকে বেরোবেন কি করে? ঢুকবার সময়ই পরিষ্কার বুঝতে পারলাম চারপাশে ছড়িয়ে আছে ওদের লোক। লাউঞ্জের মধ্যেও।'

'ওদের সঙ্গে আমাদের লোকও মিশে আছে। আর বেরোবার ব্যাপারটা ভেবে রেখেছি আমি। ওদের দেখানো পথই অনুসরণ করব। কিন্তু তোমাকে যা বলেছিলাম করেছ? বিকেলে লোক পাঠিয়েছিলে ওখানে?'

'আলবত। আপনি ঠিকই বলেছিলেন। দোতলার ওপর চিলেকোঠার ছাতে ফিট করা একটা লম্বা পোস্টের মাথায় ঘুরছিল রাডার স্ক্যানার। পাঁচশো গজ দূরের একটা অফিসের ছাত থেকে স্কোপ্ লাগানো রাইফেলের গুলি ছুঁড়ে নষ্ট করে দেয়া হয়েছে ওটাকে। এখন বেহুদা ঘুরছে ওটা লাঠির মাথায়। এলাকাটা তিন দিক থেকে কাঁটাতারের জাল দিয়ে ঘেরা। গেটে সারাক্ষণ পাহারা।'

আটটার সময় কামরায় বসেই সাপার খেয়ে নিল ওরা। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখল টেবিলের ওপর। তারপর ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিয়ে বসল গিয়ে ব্যালকনিতে, নিচু গলায় সমস্ত প্ল্যানটা বুঝিয়ে দিল রানা সাঈদকে। মাথা ঝাঁকাল সাঈদ।

উঠে পড়ল ওরা। রাইফেল দুটো কাঁধে ঝুলিয়ে নিল দু'জন। ওয়েস্ট ব্যাণ্ডে গুঁজে নিল রিভলভার। সবশেষে, মনে পড়ে যাওয়ায়, সুটকেস থেকে একটা বিশেষভাবে তৈরি অ্যাসিড পেন নিয়ে পকেটে গুঁজল রানা। কনসেনট্রেটেড নাইট্রিক এসিড ভরা তাতে—বোতাম টিপলেই পিচকারীর মত বেরোবে। তারপর একগোছা ডিসেণ্ডিং রোপ নিয়ে কামরায় তালা লাগিয়ে দিয়ে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে ছাতে।

আধখানা চাঁদ আকাশে। সেই আলোয় খাঁ-খাঁ করছে শূন্য ছাতটা। একটা লোহার হুকে বাঁধল রানা দড়ির এক প্রান্ত। দুই জোড়া ধাতুর তৈরি হাতলের মধ্যে

দিয়ে গেছে শক্ত সরু রশিটা।

'দুই হাতে মুঠো করে ধরবে হাতল দুটো। নিয়ম হচ্ছে, স্পীড বেশি চাইলে ওগুলো বেশি জোরে টিপে ধরবে। আর কমাতে চাইলে একটা হাত একেবারে ঢিল করে দেবে। বুঝেছ?'

মাথা ঝাঁকাল সাঈদ। এক মিনিটে নেমে এল ওরা হোটেলের পিছনের অন্ধকারে। সেইলরস্ ক্লাবের ওপাশ দিয়ে সোজা সাগরের দিকে চলে গেল ওরা। অপেক্ষমাণ স্পীড বোটে রানার নির্দেশে বৈঠা রাখা ছিল দুটো। সাঈদ উঠে বসতেই ঠেলে পানিতে নামাল রানা স্পীড বোট। তারপর উঠে বসে বৈঠা দিয়ে কিছুক্ষণ লগির মত ঠেলা দিয়ে বেশি পানিতে নিয়ে এল। এবার বিনাবাক্যব্যয়ে বৈঠা চালাল দু'জন। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল স্পীড বোট পুব দিকে। মাথায় একরাশ ফেনা নিয়ে ঢেউ ভেঙে পড়ছে বোটের গায়ে। ছিটকে জলকণা এসে লাগছে চোখে মুখে। দুলে দুলে উঠছে ছোট্ট বোট।

'ডুবে যাবে না তো আবার?' সাঈদ জিজ্ঞেস করল।

'না, ডুববে না। কিন্তু সাঁতারটা শিখে নাও না কেন? কত সুইমিং পুল আছে শহরে। শিখে নিলে অনেক কাজে আসবে।'

'ঠিক বলেছেন। কাল যদি সূর্যের মুখ দেখি তাহলে মেম্বার হয়ে যাব কোনও সুইমিং-ক্লাবের।'

বেশ অনেকদূর সরে এসেছে ওরা তীর থেকে। হোটেল ঢাকা পড়েছে একটা টিবির আড়ালে। এখন আর শব্দ পৌঁছবে না ওখানে। বৈঠা তুলে রেখে এভিনরুড এঞ্জিনটা স্টার্ট দিল রানা। ফরওয়ার্ড গিয়ার দিতেই ছুটল স্পীড বোট তরতর করে পানি কেটে। বৈঠা তুলে একপাশে রেখে দিয়ে কাছে এসে বসল সাঈদ। জোর বাতাসে শীত শীত করছে। পৌনে এক ঘন্টার পথ।

'তোমার চেয়ে ছোট নাকি জিনাত?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। দু'বছরের ছোট। পনেরো বছর একসাথে খেলাধুলা করে বড় হয়েছি আমরা। তারপর ও চলে গেল লাহোর।'

'যেদিন পরিষ্কার বুঝতে পারলে যে ওকে ভালবাসো, তখন নিশ্চয়ই ও অনেক দূরে সরে গেছে?'

চুপ করে থাকল সাঈদ। রানা যে হঠাৎ তার মনের কথাটা এভাবে বলে বসবে ভাবতেও পারেনি সে।

'আপনাকে বলেছে ও কিছু?'

'না। তোমার চোরা চাহনি দেখে বুঝেছি।'

আবার চুপ হয়ে গেল সাঈদ। ওর কাঁধের ওপর হাত রাখল রানা।

'এমনই হয়, সাঈদ। জীবনটাই এরকম। সবকিছুর মধ্যেই গরমিল। মানুষ একান্ত করে যে জিনিসটা চায়, কেন জানি গোলমাল হয়ে যায়, পেতে পেতেও পায় না।'

'কিন্তু এরকমটা হওয়ার কথা ছিল না, মি. রানা।' সাঈদের কণ্ঠে অদ্ভুত একটা অভিমানের সুর ধ্বনিত হলো। হৃদয়ের আগল খুলে গেল ওর। 'ছোটকাল থেকেই আমি জানতাম ও আমার স্ত্রী। চার বছর বয়সে আমার আব্বাজী মারা যান। চাচাজীই

আমাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন। চাচী-আম্মা আমাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসতেন। আমার সব আবদার অত্যাচার সহ্য করতেন হাসিমুখে। আট বছর বয়স থেকে শুনে আসছি আমাদের বিয়ে ঠিক হয়ে আছে। বড় হলে বিয়ে হবে। তখন থেকেই নিজের বৌ মনে করে কত যে অধিকার ফলিয়েছি আমি ওর ওপর!' হাসল সাঈদ। 'কিন্তু পনেরো বছর বয়স হতেই ও যেন আমার চেয়ে অনেক বড় হয়ে গেল। বুদ্ধি বিবেচনায় অনেক পেকে গেল ও। দেহেও এমন বাড়ন্ত হয়ে উঠল যে ওর দিকে চাইতে লজ্জা লাগত আমার। নিজেকে ওর পাশে খুবই অপরিণত, কাঁচা মনে হত। চাচী-আম্মা মারা গেলেন। চাচাজী মনে করলেন এখন ওকে লাহোরে কোনও বোর্ডিং স্কুলে রাখাই ভাল। নইলে চরিত্র খারাপ হয়ে যেতে পারে।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল সাঈদ। মোলায়েম চাঁদের আলো বিছিয়ে পড়েছে সমুদ্রের ওপর। কেবল জল আর জল। ঢেউয়ের মাথায় সাদা ফেনা। করাচি শহরের হাজার হাজার বাতি দেখা যাচ্ছে তারার মত বহুদূরে।

'মাঝে মাঝে ছুটিতে যখন আসত বাড়িতে, উদগ্রীব আমি, কতবার বলতে চেয়েছি। কোথা থেকে একরাশ লজ্জা এসে কণ্ঠরোধ করেছে আমার। এখন বুঝতে পারি, যদি সেদিন সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে উঠে দাবি করতাম, তাহলে আজ এভাবে ও নষ্ট হয়ে যেত না। তারপর একসময় আমি এগিয়ে এলাম। ও হেসে উড়িয়ে দিল আমাকে। অন্য জগতের মানুষ হয়ে গেছে ও তখন। হঠাৎ বিয়ে করে বসল। এসব ঘটনা তো আপনি জানেন। তখন আমি বড় হয়ে গেছি। স্বামীর সাথে ছাড়াছাড়ি হয়ে ও যখন মারীতে, আমি গিয়ে হাজির হলাম, বললাম আমার মনের কথা। ক'দিন ও আমাকে খুব আদর যত্ন করে রাখল, তারপর বলল, 'সাঈদ ভাইয়া, আমি তোমার যোগ্য নই। তোমার মত একজন ভালমানুষের জীবনটা আমি নষ্ট করে দিতে পারব না।' কাঙালের মত বললাম, 'দয়া করো আমাকে, জিনা। তোমার সমস্ত দোষ-ত্রুটি, পাপ-পূণ্য নিয়ে তুমি এসো আমার জীবনে। ধন্য করো আমাকে। তোমাকে ছাড়া আর যে কিছুই ভাবতে পারি না আমি।' দু'চোখ ভরে গিয়েছিল ওর অশ্রুতে। বলেছিল, 'আগে বলোনি কেন? সময় থাকতে তুমি আমাকে জোর করে ছিনিয়ে আনলে না কেন ওই বিষাক্ত জীবনের মায়াবী আকর্ষণ থেকে? এখন আর হয় না, সাঈদ ভাইয়া। অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

কথাগুলো মন দিয়ে শুনছিল রানা। ঢাকা বেতার কেন্দ্রের নাটকের মত কিছুটা শোনালেও রেডিওর ওপর বমি করে দিতে ইচ্ছে করল না রানার। কারণ এ নাটক রূপ লাভ করছে অতি সাধারণ হলেও একজন সত্যিকার প্রেমিকের হৃদয় মন্থন করা উপলব্ধি থেকে। শীত করছে রানার। ফ্লাস্ক থেকে খানিকটা কফি ঢেলে সাঈদের দিকে বাড়িয়ে দিল, নিজেও খেলো কয়েক ঢোক। দুই ঢোকে শেষ করল সাঈদ কফিটুকু। তারপর গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার আরম্ভ করল।

'ফিরে এলাম আমি শূন্য পাত্র নিয়ে। অনেক অনুরোধ-উপরোধেও, এমন কি চাচাজীর আদেশেও বিয়ে করিনি আমি। অপেক্ষা করে ছিলাম। কিন্তু বাচ্চাটা মারা যাওয়ার পর আবার নষ্ট হয়ে গেল ও। তিক্ত হয়ে গিয়েছে ও তখন জীবনের ওপর। অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু ও কিছুতেই দেখা করল না আমার সাথে। ওর পেছন

পেছন লাহোর, পিণ্ডি, খেশোয়ার, করাচি ছুটে বেড়িয়েছি চাচাজীর সাথে পাগলের মত। তারপর আপনি এলেন ওর জীবনে। একটা কথা ভুলেও ভাববেন না, মি. মাসুদ রানা—আপনার প্রতি আমার কোন বিতৃষ্ণা আছে মনে করলে ভুল হবে। আমি চাই ও সুখী হোক—ওর শান্তি হোক। আমার কপালে যা লেখা আছে, তাই হবে। এ লিখন তো কেউ খণ্ডাতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য কি জানেন? এত ঘটনার পরেও আমার স্নেহ ভালবাসা এতটুকু কমল না। অদ্ভুত মেয়ে ও। কিছু দোষ নেই ওর। কারও ওপর কখনও অন্যায় করেনি জিনা। কিন্তু আমারই মত ওর ভাগ্যও বিরূপ। সুখ হলো না কিছুতেই। সবাই ঠকাল ওকে।'

এই ভাবপ্রবণ যুবক জানে না জিনাতের বর্তমান অবস্থা। স্টিয়ারিং ধরে স্থির হয়ে বসে রইল রানা। আর বেশি দূর নেই। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করল সে কৌশলে। নানান কথার পর মালাকান্দ স্মাগলিং সম্পর্কে কথা তুলতেই চুপ হয়ে গেল সাঈদ। মনে মনে হাসল রানা। ব্যাটা J M T T—জাতে মাতাল তালে ঠিক। এখন ও-ই মালাকান্দের সরদার। চাচাজীর সমস্ত অপকীর্তি চালু রাখার মহান দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে ওকে। এবং বোঝা যাচ্ছে যোগ্যতার সাথেই সে-কাজ চালাবে ও। এই একটা মানুষের মধ্যে কি অদ্ভুত ভাবে নিষ্পাপ প্রেম আর ব্যবসায়িক কুটিলতা, কোমল আর কঠিনের মিশ্রণ হয়েছে ভাবতে অবাক লাগল রানার।

ছোট ছোট আধডোবা পাহাড় দেখা যাচ্ছে দূরে। আর বেশি দেরি নেই, এসে পড়েছে ওরা।

হঠাৎ তীরের ওপর একটা সবুজ আলো জ্বলেই নিভে গেল। একটু বাঁয়ে কাটল রানা। পাঁচ মিনিট পর আরও কিছুদূর সামনে দু'বার জ্বলল আর একটা সবুজ বাতি। অনেকখানি সরে এল এবার রানা তীরের কাছে। তারপর বন্ধ করে দিল এঞ্জিন। বেশ কিছুদূর আপনাআপনি চলল বোট। তারপর আবার বৈঠা চালাতে আরম্ভ করল ওরা। তীরের ওপর তিনবার জ্বলল সবুজ বাতি। আবছা মূর্তিটা চিনতে পারল রানা। দিল্লির খান।

'বৈঠার শব্দ হচ্ছে, সাঈদ,' ফিসফিস করে সাবধান করল রানা।

ধীরে ধীরে এগোল ওরা। নিঃশব্দে ইনফ্রা-রেড লেন্স লাগানো নাইট গ্লাসটা চোখে পরে নিল রানা। অনেক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এবার আঁধারের মধ্যে। দূরে একটা ইয়ট দেখা যাচ্ছে না? অর্ধেকটা আড়াল হয়ে আছে পাহাড়ের ওপাশে। তীরের দিকে দেখা গেল এরিয়ার মধ্যে বাঁধানো ঘাটে একটা লঞ্চ দাঁড়ানো। লোকজন দেখা গেল না। না ঘাটে, না লঞ্চে।

একশো গজ জায়গা খোলা আছে সমুদ্রের দিকে। ওখান দিয়েই ঢুকতে হবে। তীরে উঠে ঠেলে দিল রানা স্পীড বোটটা বেশি পানিতে। হাওয়ার ধাক্কায় ধীরে ধীরে চলে গেল ওটা যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে। পাড়ে দাঁড়িয়ে রইল রানা ও সাঈদ।

একটা ছোট মেঘের আড়ালে চলে গেল চাঁদটা। ছুটে লম্বা স্টোররুমের পাশে গিয়ে দাঁড়াল ওরা। এই লম্বা ঘরটার ওপাশে খানিকটা জায়গা ছেড়ে রাস্তার পাশের দোতলা বিল্ডিং। ওদিকে আপাতত কোনও ঔৎসুক্য নেই রানার। প্রথমে ঢুকতে হবে এই ঘরটার মধ্যেই।

বড়-সড় একটা দরজা দেখা গেল পেছন দিকে। এই দরজা দিয়েই বোধহয় লোডিং-আনলোডিং হয়। তালা মারা। কজায় তারের অস্তিত্ব দেখে বুঝল রানা বার্গলার অ্যালার্মের ব্যবস্থা আছে সেখানে। তাতে রানার কিছুই এসে যায় না। এদিক দিয়ে ঢোকার চেষ্টা করবে না সে। মাছের কারবার যখন, তখন সামনে এগোলে নিশ্চয়ই কাঁচের দেয়াল থাকবে আলো আসবার জন্যে। দরজাটা ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেল ওরা।

ঠিক। কিছুদূর এগিয়েই দেখা গেল লোহার ফ্রেমে কাঁচ বসানো আছে। কিন্তু বেশ অনেকখানি উঁচুতে। ভেতর থেকে ম্লান আলো আসছে। সাঈদের কাঁধে চড়ে কমার্শিয়াল ডায়মণ্ড বসানো কাঁচ কাটার স্টিক দিয়ে এক বর্গ গজ আন্দাজ জায়গার কাঁচ তিন দিক থেকে কেটে ফেলল রানা। তারপর স্কচ টেপ দিয়ে অনেকগুলো স্টিচ লাগাল যাতে চতুর্থ দিকে কাটলেই ঝন্ ঝন্ করে পড়ে না যায়। বাঁ দিক, ডান দিক আর উপর দিকে ভাল মত স্টিচ লাগিয়ে এবার একটানে নিচের দিকটা কেটে ফেলল রানা। সামান্য ঠেলতেই প্রায় নিঃশব্দে বেরিয়ে এল কাঁচ। দুই হাতে সাবধানে সেটাকে ধরে পায়ে ইশারা করতেই ধীরে ধীরে বসে পড়ল সাঈদ।

দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে কাঁচটা রাখল রানা। সাঈদকে ওখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার নির্দেশ দিয়ে রাইফেলটা মাটিতে শুইয়ে রেখে লাফিয়ে ধরল সে লোহার ফ্রেম। তারপর পাকা জিমন্যাস্টের মত পা দুটো টেনে তুলে নিয়ে গেল ভেতরের দিকে।

কি যেন ঠেকল পায়ে। পা দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে দেখল অ্যাকুয়ারিয়াম একটা। হঠাৎ একটা শক্ খেয়ে চমকে উঠল রানা। আপনাআপনি ভাঁজ হয়ে গেল হাঁটু। কোনও বিষাক্ত মাছ কাঁটা মারল না তো? ফ্রেম থেকে বাঁ হাতটা সরিয়ে একটা পেন্সিল টর্চ বের করল রানা। মুখ খোলা অ্যাকুয়ারিয়ামের মধ্যে অস্বাভাবিক ভাবে পানি নড়তে দেখে সত্যিই ঘাবড়ে গেল রানা। সাবধানে এক পা রাখল টেবিলের ওপর। বেশি ভর দিতে সাহস হলো না, ভেঙে পড়তে পারে। হালকা করে টেবিলের ওপর এক পায়ের ভর দিয়ে ছেড়ে দিল ডান হাত। আরেক পা পড়ল মাটিতে। সামান্য শব্দ হলো। সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে প্রথমেই লেবেলটা পড়ল রানা। ইংরাজিতে লেখা আছে:'ঈল।' যাক, বাঁচা গেল। বিষাক্ত কিছু নয়। সাউথ আমেরিকান এই মাছ শুধু ইলেকট্রিক শক দেয়। হর্স কিলার বলে একে। জুত মত পেলে অনায়াসে একটা মানুষ খুন করে ফেলতে পারে। একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে টর্চ নিভিয়ে দিল রানা। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। কোনও সাড়াশব্দ নেই কোথাও।

পাশাপাশি কয়েক সারিতে অসংখ্য কাঁচের ট্যাঙ্ক চার পায়া টেবিলের ওপর রাখা। কয়েকটা ট্যাঙ্কে আলোর ব্যবস্থা আছে। কাঁচের দেয়াল ভেদ করে ম্লান চাঁদের আলো এসে পড়েছে ঘরের ভেতর। অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা বিরাজ করছে চারদিকে।

বাম পাশের সারিতে কয়েকটা লেবেল পড়ল রানা: ফ্লাইং ফক্স, ডিস্কাস, লোচ, প্লেটি, সোর্ড টেইল, জার্মান ফাইটার, গাপ্পি, গোরামি, ব্ল্যাক মলি, নিয়ন, সিক্লিড, প্যারাডাইস, অ্যাঞ্জেল, ল্যাবিরিন্থ, গোল্ড ফিশ, সিয়ামিজ ফাইটার আরও

কত কি। আর ডান দিকের সমস্ত অ্যাকুয়ারিয়ামের গায়ে সাঁটানো কাগজে লাল কালিতে ছাপা:

DANGER
Poisonous Fish

ছোট বড় নানান সাইজের ট্যাঙ্ক—মাছের আকৃতি অনুসারে।

কয়েকটা লেবেলে নাম পড়ল: গীটার ফিশ্, মাড ফিশ্, লায়ন ফিশ্, ঈল, টর্পেডো স্কেটস্, ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান স্করপিয়ন। এ ছাড়াও কিছু সামুদ্রিক বিষধর সাপের নামও পাওয়া গেল: হিমোফিস হিমোডার্মা, হিমোসরাস, ইত্যাদি। রানা লক্ষ করল এদিকের সারির প্রত্যেকটা ট্যাঙ্কে একটা করে মাছ বা সাপ। দু'শো আড়াইশো ট্যাঙ্ক আছে ডানধারের এই দুই সারিতে। চারদিকে কেমন একটা বোটকা মত গন্ধ।

বহুরকম মাছের খাবার রাখা আছে মেঝেতে টিনের ট্রের মধ্যে। কিছু পাউডার করে রাখা, কিছু জ্যান্ত। কয়েকটা চিনতে পারল রানা। ব্লাড-ওয়ার্ম, টিউবিফেক্স, মাইক্রো-ওয়ার্ম, হোয়াইট-ওয়ার্ম, ড্যাফনিয়া, ব্রাইন শ্রিম্প্। কয়েকটা কাঁচের বোয়েমেও কয়েক পদের পাউডার ও ফ্লোটিং বল রাখা।

জায়গায় জায়গায় বিভিন্ন আকারের অসংখ্য সুদৃশ্য ঝিনুক আর শঙ্খ স্তূপ করা। এতেও আসে প্রচুর ফরেন্ কারেন্সি।

ঘরের ভেতর গরম। বদ্ধ আবহাওয়া। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে আরম্ভ করল রানার কপালে। বাইরের মুক্ত বাতাসের জন্যে প্রাণটা চঞ্চল হয়ে উঠল ওর। ওদিকে সাঈদ নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে উঠেছে ভেতরে আসবার জন্যে।

বিষাক্ত মাছের কথা শুনেই একটা কথা মনে এসেছিল রানার। সেটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। তাই সাঈদকে বাইরে রেখে এসেছে।

হাঁটুর নিচে পায়ের সাথে বাঁধা খাপের মধ্যে থেকে বের করল রানা অফিস থেকে পাওয়া নতুন ছুরিটা। ইঞ্চি পাঁচেক লম্বা একটা লায়ন ফিশের জারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। টর্চের আলো মাছটার দিকে ধরতেই নড়েচড়ে উঠল সেটা। রানার জানা আছে এ মাছ আক্রমণ করে না, আত্মরক্ষার জন্যে ব্যবহার করে বিষ। না ছুঁলে ভয়ের কিছু নেই।

ছুরিটা পানি স্পর্শ করতেই খাড়া হয়ে গেল ওর মেরুদণ্ডের ওপরের কাঁটাগুলো প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর ছবির মত। চোখ দুটো বেরিয়ে এসেছে বাইরে। বিপদ টের পেয়ে গেছে সে। ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে পেছনে। ঘ্যাঁচ করে দুই চোখের মাঝখানে মাথার মধ্যে গাঁথল রানা ছুরিটা। তারপর কাঁচের সাথে ঠেসে ধরে ধীরে ধীরে উঠিয়ে আনল ওপরে। মাছটা ছটফট্ করছে আর লেজের বাড়ি মারছে ছুরিতে। একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ওটাকে ফেলল রানা মেঝের ওপর। তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে থাকল মাছটা মাটিতে পড়ে। জুতো দিয়ে মাড়িয়ে ওটার ভব যন্ত্রণা ঘুচিয়ে দিল ও। তারপর আস্তিন গুটিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিল অ্যাকুয়ারিয়ামের তলায় বালু আর কাদার মধ্যে।

আছে। শক্তমত কিছু ঠেকল রানার হাতে।

বিষাক্ত মাছ আর সাপের কারবার দেখে ওর মনে যা সন্দেহ হয়েছিল, তাই ঠিক। বালি আর কাদার মধ্যে থেকে বের করে আনল রানা অন্তত একশো ভরি

ওজনের একটা সোনার বার।

ওপরের অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে বাম হাতে সেটাকে নিল রানা। তারপর আবার হাত ঢুকিয়ে বাইরে না এনেই গুণে দেখল, আরও তিনটে আছে। এই ছোট ট্যাঙ্কেই যদি চারটে থাকে তাহলে বড়গুলোতে নিশ্চয়ই কমপক্ষে আটটা করে আছে। আন্দাজ করল রানা। আড়াইশো অ্যাকুয়ারিয়ামে কমপক্ষে দুই লক্ষ ভরি সোনা। একশো তিরিশ টাকা হিসাবে দাম হচ্ছে কত কোটি টাকা? প্রতি ট্রিপে যদি এই পরিমাণ চালান যায় তাহলে বছরে? ওরেব্বাপ! বিরাট ব্যাপার!

খুব দ্রুত চিন্তা করছে রানা। আজকের এই অভিযানের ফলাফল অনিশ্চিত। হয়তো আজই ওর জীবনের শেষ দিন। কিন্তু এই সোনার ব্যাপারটা জানানো দরকার কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সকে। ভেবে দেখল, রাত বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে অনীতা ফোন করবে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই এসে হাজির হবে আর্মড় ফোর্স। একটা জারে মাছ না দেখতে পেলেও ওরা আসল ব্যাপারটা ধরতে না-ও পারে। কাজেই সোনার বারটা এমন জায়গায় রাখা দরকার যেখানে রাখলে সোয়া বারোটার আগে এদের চোখে পড়বে না, অথচ পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর চোখে পড়বে এবং সবটা ব্যাপার বুঝতে পারবে ওরা।

ছুরির আগা দিয়ে সোনার বারটার ওপর M. R.-9 লিখল রানা। তারপর মরা মাছটাকে ছুরিতে গেঁথে নিয়ে একটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকার টেবিলের ওপর ট্যাঙ্কের আড়ালে রেখে দিল সোনা আর মাছ পাশাপাশি।

এবার ফিরে এল ও যেখান দিয়ে ঢুকেছিল সেইখানে। সঙ্কেত পেয়েই একটা রাইফেল ভেতরে চালান দিল সাঈদ। দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখল সেটা রানা। কিন্তু দ্বিতীয় রাইফেল চালান দেয়ার আগেই একসাথে জ্বলে উঠল ঘরের মধ্যে পঁচিশ-তিরিশটা একশো পাওয়ারের বাল্ব। সেই সঙ্গে কানে এল ভয়ঙ্কর একটা হিংস্র গর্জন।

বারো

গুংগা!

চমকে উঠল রানা। একটানে বের করল রিভলভার।

পঁচিশ গজ দূরে মেইন গেটটা খুলে গেছে। সেই গেট দিয়ে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে দানব-দেহী গুংগা। রানা বুঝতে পারল রিভলভার দিয়ে ঠেকানো যাবে না ওকে। রাইফেলটা তুলে নিতে যাবে, এমন সময় বোঁ করে দশ ইঞ্চি ইটের সমান একটা পাথর এসে লাগল দেয়ালে খাড়া করে রাখা রাইফেলের বাঁটের ওপর। ছিটকে চলে গেল রাইফেল বারো চোদ্দ হাত দূরে।

আরেকটা পাথর আসছিল ছুটে। চট করে মাথা নিচু করল রানা। ঝনঝন্ করে ভেঙে পড়ল পিছনের অ্যাকুয়ারিয়াম। বিষাক্ত মাছের। লাফিয়ে সরে গেল রানা বামদিকে। আবার গর্জন শোনা গেল। অনেকখানি এগিয়ে এসেছে গুংগা তত্ক্ষণে। কোমরের সাথে ঝোলানো একটা পাথরভর্তি বড় থলে। তার একমাত্র অমোঘ অস্ত্র।

আজ সে বাগে পেয়েছে রানাকে।

গুলি করল রানা। অসম্ভব ক্ষিপ্রতার সাথে একপাশে সরে গেল গুংগা। দূরের একটা ট্যাঙ্কের মধ্যে ঠুস্ করে ঢুকল রানার গুলি। মেঝের ওপর পানি পড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

দমে গেল। সম্পূর্ণ দমে গেল রানার মনটা। আশ্চর্য! মানুষ, না পিশাচ? এতখানি ক্ষিপ্রতা এক পিশাচেই সম্ভব! কোন্ এক ইংরাজি বইয়ে পড়েছিল, আফ্রিকার জঙ্গলে অন্ধকার রাতে একটা ষাঁড় মেরে খেতে খেতে রাইফেলের শব্দ শুনেই লাফিয়ে সরে গিয়েছিল এক সিংহ। মনে করেছিল, হয় গাঁজা মারছে, নয় হাত কেঁপে গিয়েছিল শিকারীর। কিন্তু আজ নিজের চোখে সেই রকম ক্ষিপ্রতা দেখে ভয়ে এবং বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। আবার গুলি করল রানা। এবারও সরে গেল গুংগা। শব্দ তো শুনতে পাচ্ছে না, রানার আঙুলের নড়া দেখেই টের পাচ্ছে সে। ছুটে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে আবার একটা পাথর ছুঁড়ল সে রানার দিকে।

চট করে বসে পড়ল রানা টেবিলের তলায়। পাথর লাগল এসে অ্যাঞ্জেল ফিশের ট্যাঙ্কে। ঝুপ ঝুপ করে সব পানি পড়ল রানার মাথায়। কলারের মধ্যে দিয়ে শার্টের ভেতর ঢুকল একটা মাছ। ফড় ফড় করে লেজ ও পাখার অস্বস্তিকর বাড়ি মারছে সে রানার ঘাড়ে।

চোখটা মুছে নিয়ে টেবিলের তলা দিয়ে গুংগার পা লক্ষ্য করে গুলি করল রানা। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো। কয়েক পা এগিয়ে এসেছে গুংগা।

এমন সময় গর্জে উঠল আরেকটা রিভলভার। রানা চেয়ে দেখল কাটা কাঁচের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সাঈদকে। একহাতে রিভলভার। অর্ধেকটা ঢুকে পড়েছে সে ঘরের মধ্যে।

উঠে দাঁড়িয়ে দেখল রানা গুংগার বাম বাহুতে একটা সরু রক্তের ধারা দেখা যাচ্ছে। ট্যাঙ্কের আড়ালে আড়ালে বেশ খানিকটা সরে গেল রানা। হাতে ব্যথা পেয়ে হুঙ্কার ছেড়ে একটা পাথর তুলল গুংগা।

এমন সময় 'উহ্!' করে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনেই ফিরে চাইল রানা। দেখল ঈল মাছের ট্যাঙ্কসহ হুড়মুড় করে পড়ল সাঈদ মেঝের ওপর মুখ থুবড়ে। নিশ্চয়ই ভয়ঙ্কর ইলেকট্রিক শক খেয়েছে। হয়তো ট্যাঙ্কের মধ্যেই নেমে পড়েছিল।

এই এক মুহূর্তের অন্যমনস্কতাটুকু কাজে লাগাল গুংগা। দড়াম করে একটা পাথর এসে পড়ল রানার ডান কব্জির ওপর। ছিটকে কয়েক হাত দূরের একটা মুখ খোলা অ্যাকুয়ারিয়ামের মধ্যে গিয়ে পড়ল রিভলভার। জয়ের উল্লাসে আরেকটা হুঙ্কার ছাড়ল গুংগা।

অসহ্য যন্ত্রণায় একটা গোঙানি বেরিয়ে এল রানার মুখ দিয়ে। কব্জিটা ভেঙেই গেছে বোধহয়। বাম হাতে চেপে ধরল সে ডান হাতের কব্জি।

নিরস্ত্র সে। ছুটে এগিয়ে আসছে পিশাচটা। সাঈদের কাছাকাছি যেতে পারলেও হত। ওর রিভলভারটা কাজে লাগানো যেত। কিন্তু সে উপায় নেই। তাড়া খাওয়া মুরগীর বাচ্চার মত মাছের জারের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে বেড়াতে থাকল সে। বোঁ করে কানের পাশ দিয়ে গিয়ে দেয়ালে লাগল একটা পাথর।

নিজের নিরুপায় অবস্থা ভালমত উপলব্ধি করে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। কারণ শুংগা যদি ওকে ওয়ালী আহমেদের কাছে ধরে নিয়ে যাবার জন্যে এসে থাকে তাহলে আত্মসমর্পণ করলে এক্ষুণি হত্যা করবে না। কিন্তু এখন ওকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে ঠিক মেরে ফেলবে। খুনের নেশা দেখতে পেয়েছে সে শুংগার চোখে।

বেরিয়ে এল রানা মাঝের প্রশস্ত পথটায়। এগিয়ে আসছিল শুংগা তুফানের মত। দুই হাত মাথার ওপর তুলে দাঁড়াল রানা।

থমকে দাঁড়িয়ে গেল শুংগাও। বিস্মিত ওর চোখমুখ। বহুদিন পর একজন যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পেয়ে আন্তরিক খুশি হয়েছিল সে। কিন্তু এত সহজে হাল ছেড়ে দিল? আক্রমণের আনন্দটা আর থাকল কোথায়? কিন্তু···সতর্ক হলো শুংগা। এই লোকটি তো সহজে কাবু হবার বান্দা নয়! নিশ্চয়ই কোন কুমতলব আছে। সাবধানে এগোল সে সামনে। রানা মাথার ওপর হাত তুলে পিছিয়ে যাচ্ছে এক-পা এক-পা করে। পাঁচ হাত দূরেই শুংগা। শুংগার চোখ পড়ল পিছনে মাটিতে পড়ে থাকা সাঙ্গদের ওপর। এতক্ষণ দেখতে পায়নি সে ওকে। রানাকে পিছিয়ে ওদিকে যেতে দেখে একটা হুঙ্কার ছেড়ে হাতের ইশারায় থামতে বলল সে। কোঁচড় থেকে পাথর বের করল একটা।

হঠাৎ রানার মনে পড়ল বুক পকেটের বল-পয়েন্ট পেনসিলটার কথা। একটানে বের করেই টিপে দিল শুংগার মুখ লক্ষ্য করে। এ অস্ত্র আর কোনদিন প্রয়োগ করেনি সে। দেখল কনসেনট্রেটেড্ নাইট্রিক অ্যাসিড ছুটে গিয়ে চোখে-মুখে পড়তেই টগবগ করে ফুটতে লাগল শুংগার মুখের মাংস। বড় বড় ফোস্কা আর ঘায়ে বীভৎস আকার ধারণ করল চেহারাটা তিন সেকেণ্ডে।

যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল শুংগা। হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল পাথরটা। ভয়ঙ্কর মুখটা দুইহাতে ঢাকল সে। একটা চোখ সম্পূর্ণ গলে গিয়েছে। আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে আরেকটা ভীত চোখ চেয়ে আছে রানার দিকে।

ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুটল রানা রাইফেলটার দিকে। কিন্তু দুই পা এগিয়েই হঠাৎ একটা লোহার হুকে পা বেধে সে মাটিতে পড়ে গেল। হুকটা সরে গেল একপাশে। প্রাণভয়ে আবার লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা।

কিন্তু কোথায় শুংগা? গুলি খাওয়া চিতাবাঘের মত লাফিয়ে উঠেছিল শুংগা ব্যাপার বুঝতে পেরে। কিন্তু তখন দেরি হয়ে গিয়েছে। একটা আতঙ্কিত তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল ওর মুখ থেকে। অবাক হয়ে দেখল রানা চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেছে শুংগা ভোজবাজির মত।

কাছে গিয়ে দেখল একটা আট ফুট বাই আট ফুট চারকোনা গর্ত সৃষ্টি হয়েছে মেঝেতে। নিচে অন্ধকার। পর মুহূর্তেই চোখে পড়ল গর্তের একটা কিনারায় শুংগার আঙুল দেখা যাচ্ছে। পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে কিনারাটা ধরে ফেলেছে সে। কিন্তু উঠতে পারছে না উপরে। কেউ সাহায্য না করলে পারবেও না।

এতক্ষণ পর দুই কোমরে হাত রেখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস গ্রহণ করল রানা। কপালের ঘাম মুছে নিল রুমালে। অর্ধেকটুকু অ্যাসিড আছে—পেনটা পকেটে পুরল আবার। তারপর পকেট থেকে টর্চ বের করে ধরল শুংগার মুখের

ওপর। স্থির নিষ্পলক বোবা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রানার মুখের দিকে একটা চোখ।

কি আছে নিচে? গুংগার হাতের পাথরটা ফসকে পড়ে গিয়েছিল একধারে। পা দিয়ে ঠেলে এনে ফেলল রানা সেটাকে গর্তের মধ্যে। 'টুম' করে শব্দ হলো। তারপরই ছলাত্ করে ওপরে ছিটকে এল পানি।

নিশ্চয়ই পিরানহা! এর মধ্যে ফেলে হত্যা করা হয়েছে মোহাম্মদ জানকে। আঙুলের মাথায় খানিকটা পানি নিয়ে জিভে ঠেকাতেই সন্দেহ রইল না আর। নোনতা! মাটির তলা দিয়ে সাগরের সাথে যোগ আছে এই ট্যাঙ্কের।

গুংগার আঙুলগুলো সাদা দেখাচ্ছে—নখগুলো রক্তশূন্য। প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে ঝুলছে সে মৃত্যু-গহ্বরের মুখে। আবার টর্চ ধরল রানা ওর মুখের ওপর। করুণ মিনতি ওর এক চোখে। একটা গোঙানি বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে। থর থর করে কাঁপছে ওর হাতের পেশীগুলো।

রানার চোখের সামনে ভেসে উঠল মৃত মোহাম্মদ জানের মুখ। স্বপ্নের সেই দৃশ্যটা পরিষ্কার দেখতে পেল সে আবার। অনীতার মুখও ভেসে উঠল মনের পর্দায়। অনীতা, জিনাতের আর্তনাদ—গুংগার পৈশাচিক উল্লাস···

আগুন ধরে গেল মাথার মধ্যে।

ছোট্ট দুটো লাথি দিয়ে সরিয়ে দিল সে আটটা আঙুল।

একটা আতঙ্কিত চিৎকার হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল মাথাটা পানির তলায় চলে যেতেই। রানা মনে মনে ভাবল, এক নম্বর গেল। এবার ওয়ালী আহমেদ। ডান হাতটা টন টন করে উঠতেই চেয়ে দেখল ডবল-সাইজ গুংগার কব্জির মত দেখাচ্ছে সেটা। উত্তেজনার মাথায় ভুলেই গিয়েছিল সে ব্যথার কথা।

ততক্ষণে জ্ঞান ফিরে উঠে দাঁড়িয়েছে সাঈদ। রানা গিয়ে দাঁড়াল পাশে। দূরে কয়েকটা বুটের শব্দ শোনা গেল। রাইফেলটা তুলে নিল রানা মাটি থেকে। তারপর এগিয়ে গেল ওরা খোলা গেটের দিকে।

'গুংগা কোথায়?'

কালো গর্তটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে লোহার বল্টুটা উল্টো দিকে ফেরাল রানা জুতো দিয়ে। খটাং করে বন্ধ হয়ে গেল গর্তমুখ। বুটের শব্দ কাছে এসে পড়েছে। দৌড় দিল রানা ও সাঈদ। দরজা দিয়ে মুখ বের করেই দেখতে পেল ওরা জনা আষ্টেক লোক পাশের দোতলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছে এদিকে। প্রত্যেকের হাতেই রিভলভার। গুলি গালাচের শব্দ শুনতে পেয়েছে ওরা।

দরজার আড়াল থেকে একসাথে গর্জে উঠল রানার রাইফেল আর সাঈদের রিভলভার। দু'জন আছড়ে পড়ল মাটিতে। থমকে দাঁড়াল বাকি সবাই। সামনে কাউকে দেখতে না পেয়ে ভড়কে গেল। রানার রাইফেলের বোল্ট টানার অবসরে আর একটা গুলি করল সাঈদ। একজনের পায়ে গিয়ে লাগল সাঈদের দ্বিতীয় গুলি। বসে পড়ল সে-ও। বাকি পাঁচজন ঘুরে দাঁড়িয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল ছত্রভঙ্গ হয়ে।

এমন সময় তীক্ষ্ণ একটা নারী কণ্ঠের চিৎকারে একসাথে চমকে উঠল রানা ও সাঈদ। বাঁ দিক থেকে আসছে। এই স্টোর রুমের পাশের কোনও একটা ঘর থেকে।

জিনাত!

ছুটে গেল রানা ও সাঈদ সেদিকে। কাঁচের জানালা দিয়ে দেখা গেল একটা স্ত্রীলোকের চেহারা। কি একটা জিনিস ঘুরাচ্ছে সে দেয়ালের গায়ে। রাইফেলের বাঁটের প্রচণ্ড আঘাতে কড়া ভেঙে ছুটে এল দরজার তালা। ঘরে ঢুকতেই হা-হা-হা-হা করে হেসে উঠল স্ত্রীলোকটি। এ কে? প্রথমে চিনতেই পারেনি রানা। এই চেহারা হয়েছে জিনাতের? উদভ্রান্ত দুই চোখ টকটকে লাল, চোখের কোণে কালি। চাপ চাপ রক্ত লেগে আছে জামা কাপড়ে। হাতে, মুখে, গলায় ধারাল নখের চিহ্ন। মাথার চুল উস্কখুস্ক।

ওদের দেখেই হা-হা করে হেসে উঠল জিনাত আবার। মট্ মট্ করে একগোছা চুল ছিঁড়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিল। তারপর খোলা দেয়ালে-আলমারির মধ্যে বসানো একটা চাকার হাতল ধরে ঘোরাতে থাকল। মাথা খারাপ হয়ে গেছে জিনাতের।

'জিনাত!' ডাকল রানা।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। একবার চোখ পাকিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে নিজের কাজে মন দিল জিনাত। চিনতেই পারল না রানাকে।

ছুটে গিয়ে সাঈদ ধরল জিনাতের হাত।

'জিনা! জিনা ব্যাহেন!'

অবাক হয়ে সাঈদের দিকে চাইল জিনাত। চিনতে পারল ধীরে ধীরে।

'সাঈদ ভাইয়া, উও কওন হ্যায়?' রানার দিকে ভীত-চকিত দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞেস করল জিনাত। তারপর চিৎকার করে উঠল তীক্ষ্ণ কণ্ঠে 'ভাগো, সাঈদ ভাইয়া!'

জিনাতকে সাঈদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ছুটল রানা ওয়ালী আহমেদের উদ্দেশে। ওই বাড়িতেই নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে ওকে।

ফিশ্‌স্টোরের দরজার সামনে এসে পৌঁচেছে রানা, এমন সময় একটা সরু দড়ির ফাঁস এসে পড়ল ওর গলায়। দু'জন চেপে ধরল দুই হাত। হেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল ওকে স্টোরের ভেতর।

তেরো

হাত পা ছুঁড়ে ছুটবার চেষ্টা করল রানা। ফল হলো না। রাইফেলটা কেড়ে নিয়ে দড়াম করে এক বাড়ি মারল একজন রানার পশ্চাতদেশে। কয়েক পা এগিয়ে গেল রানা সে ধাক্কায়। বুঝল, বাধা দেয়ার চেষ্টা বৃথা। একজন বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরেছে ওর ফুলে ওঠা কব্জি। বাম হাতে এতগুলো লোকের সাথে পারবে না সে।

তাছাড়া ওয়ালী আহমেদের কাছে পৌঁছবার আগেই শেষ হয়ে যেতে চায় না সে। খোদা! কিছু শক্তি অবশিষ্ট রেখো। ওয়ালী আহমেদের কণ্ঠনালীটা ছিঁড়ে ফেলতে পারলে আর কিছুই চায় না সে। তারপর ওর কপালে যা হয় হোক।

সমুদ্রের দিকে স্টোর-হাউসের একটা দরজা খুলে হাঁ করা। ওই পথেই এসেছে ওরা। ওই পথেই বাইরে বের করে আনল রানাকে। কোথায় নিয়ে চলেছে ওকে ওরা? তাহলে কি প্রতিশোধ নেয়া হলো না? লঞ্চ ঘাটের দিকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে

চলল ওরা রানাকে।

বাইরে খোলামেলা জোলো হাওয়া। সমুদ্রের একটানা সোঁ সোঁ গর্জন। আর আকাশে আধখানা চাঁদ। সারা আকাশ জুড়ে টিপ্ টিপ্ করছে অসংখ্য ম্লান তারা। রানার হাত ঘড়িতে ঠিক বারোটা বাজে। রানা ভাবল, কার বারোটা বাজল? ওর, না ওয়ালী আহমেদের।

সরু দুটো তক্তা জোড়া দিয়ে লঞ্চে ওঠার গ্যাংওয়ে বানানো হয়েছে। কয়েকটা ঝটকা দিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বার বৃথা চেষ্টা করল রানা। সতর্ক ছিল লোকগুলো। দড়াম করে পিঠের ওপর পড়ল রাইফেলের কুঁদো। সামনের টানে এবং পিছনের কয়েকটা প্রবল ধাক্কায় লঞ্চের ওপর উঠে এল সে চোখের সামনে প্রচুর শর্ষে ফুল দেখতে দেখতে। কিন্তু এই ধস্তাধস্তিতে কাজ হলো। বুকের কাছে শার্টের একটা বোতাম ছিঁড়ে গেল।

একটা কেবিনের দরজায় তিনটে টোকা দিল একজন।

'ভেতরে এসো,' গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

ওয়ালী আহমেদ! চিনতে পারল রানা গলার স্বর। লাফিয়ে উঠল ওর হৃৎপিণ্ড। আল্লা! এখনও সুযোগ আছে! শেষ চেষ্টা করে দেখবে সে। নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করল রানা। মাথা ঠিক রাখতে হবে এখন।

প্রশস্ত একটা কেবিন। ইজি চেয়ারে শুয়ে আছে ওয়ালী আহমেদ। হাতের কাগজটা কোলের ওপর নামিয়ে রাখা।

'শেষ পর্যন্ত আসতেই হলো আপনাকে, মিস্টার মাসুদ রানা। কিন্তু দুঃখ, আমার ইচ্ছেমত এক্সপেরিমেন্টাল মৃত্যু দিতে পারলাম না আপনাকে। অবশ্য মোহাম্মদ জানের ওপর দিয়ে সে কাজটা সেরে নেয়া গেছে অনেকটা। বোঝা গেল আড়াই মিনিটের বেশি লাগবার কথা নয়। ভীতু বেড়াল-ছানার মত সারা দিন হোটেলের মধ্যে বসে থাকলেন সারা হোটেলময় একঝাড় টিকটিকি ছড়িয়ে। ভাবছিলাম ফস্কে গেলেন বুঝি। কিন্তু বিদায়ের আগে ঠিক দেখা হয়ে গেল। কপালের লিখন খণ্ডাবে কে!'

রানা কোন উত্তর দিল না। ডান হাতের কব্জির ব্যথায় মুখ দিয়ে গোঙানি বেরিয়ে এল একটা। হাতটার দিকে চেয়ে মৃদু হাসল ওয়ালী আহমেদ। একটা পান ফেলল মুখে।

'আজ আর গত কালকের মত লেকচার দিয়ে আপনার বিরক্তি উৎপাদন করব না। আর তিন মিনিটের মধ্যেই মৃত্যু ঘটবে আপনার। পাথর বেঁধে সাগরে ফেলে দেয়া হবে লাশটা। আমি জানি কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টোর হাউসটা ঘিরে ফেলবে আর্মড ফোর্স। আমার বিরুদ্ধে কিছুই পাবে না তারা সেখানে। তবু ওরা এসে পড়বার আগেই আমি ইয়টে পৌঁছে যেতে চাই। সন্দেহজনক কিচ্ছু নেই ওই ইয়টে। বিনা বাধায় দু'হাজার নয়শো মাইল, অর্থাৎ চিটাগাং পর্যন্ত চলে যাবে ওই ইয়ট। এখান থেকে চল্লিশ মাইল দক্ষিণে একটা হেলিকপ্টার এসে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে রাওয়ালপিণ্ডি।'

ঘড়ির দিকে চাইল ওয়ালী আহমেদ।

'আর দু'মিনিট আছে। আপনার শেষ ইচ্ছা বলতে পারেন, মিস্টার মাসুদ

রানা।'

'দুই মিনিটের আগে মারবেন না আমাকে?'

'না।'

'আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে আপনার দু'মিনিট পূর্ণ হবার আগেই আমি ঢলে পড়ব মৃত্যুর কোলে,' বলল রানা। চোখের ইঙ্গিতে বোতাম-ছেঁড়া শার্টের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওয়ালী আহমেদের। 'বিষ ছিল এ বোতামে। খেয়ে নিয়েছি আমি।'

বিস্মিত দৃষ্টি মেলে চাইল ওয়ালী আহমেদ রানার দিকে। ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে আসছে রানার দেহটা। ঢুলছে সে অল্প অল্প। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না আর। টেনে টেনে বলল, 'আমার শেষ ইচ্ছা পূরণ করবেন?'

মাথা নাড়ল ওয়ালী আহমেদ। 'হ্যাঁ।'

'তাহলে চিঠি দেব একটা। আমার···আমার বাগদত্তা স্ত্রীর কাছে। উহ্! আপনার বিরুদ্ধে কিছুই···কিছুই থাকবে না সে চিঠিতে। উহ্, পানি!'

হাঁপাতে থাকল রানা। লাল হয়ে উঠল ওর চোখ মুখ। মুচকে হাসল ওয়ালী আহমেদ। সামনের টেবিলে রাখা একটা সাদা প্যাডের দিকে ইঙ্গিত করতেই একজন তুলে ধরল সেটা রানার সামনে। পা দুটো কাঁপছে রানার থরথর করে। ডান হাতটা ছেড়ে দেয়া হলো। কাঁপা কাঁপা হাতে পকেট থেকে বল পয়েন্ট পেন বের করল রানা।

কিন্তু বোতাম টেপার আগেই টের পেয়ে গেল ওয়ালী আহমেদ। চট্ করে পেপার তুলে ধরায় মুখ পর্যন্ত গেল না অ্যাসিড—কাগজে বাধা পেয়ে টপ্ টপ্ করে পড়ল কয়েক ফোঁটা ভুঁড়ির ওপর। ফড়ফড় করে পুড়তে থাকল ভুঁড়ির চামড়া। জ্বলুনির চোটে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার দিয়ে তড়াক করে দাঁড়িয়ে গেল ওয়ালী আহমেদ।

এক ঝটকায় বাঁ হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা। বাকি অ্যাসিডটুকু শেষ করল স্যাঙাতদের ওপর। পাগলের মত নাচানাচি আরম্ভ করল লোকগুলো। অন্ধের মত ছুটাছুটি শুরু করল ঘরের মধ্যে।

ওয়ালী আহমেদ দৌড়ে গিয়ে একটা দেরাজ টান দিল। সাথে সাথেই সিংহের মত লাফিয়ে পড়ল রানা ওর ওপর। পিস্তলটা আর বের করা হলো না। শিরদাঁড়ার ওপর রানার কনুয়ের এক প্রচণ্ড গুঁতো খেয়ে বাঁকা হয়ে গেল ওর দেহটা। তারপর পাঁজরের ওপর এক লাথি খেয়ে ছিটকে পড়ল ওয়ালী আহমেদের মেদ বহুল দেহটা মেঝেতে। কব্জির ব্যথার কথা ভুলে গেল রানা। বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টিপে ধরল ওর টুঁটি। ঠিকরে বেরিয়ে এল ওয়ালী আহমেদের চোখ দুটো বাইরে।

এমন সময় স্যাঙাতদের একজন এসে চেপে ধরল রানার চুলের মুঠি। ওদের কথা ভুলেই গিয়েছিল রানা। পায়ে বাঁধা ছুরিটা বের করে চালিয়ে দিল সে লোকটার পেট আন্দাজ করে। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল রক্ত। চুল ছেড়ে দিয়ে আর্তনাদ করে চিৎ হয়ে পড়ল লোকটা। আর রিস্ক নেয়া যায় না। লাফিয়ে উঠে দেরাজ থেকে বেরোটা অটোমেটিক পিস্তলটা বের করল রানা। স্লাইড টানতেই ইজেক্টারের টানে

ছিটকে বেরিয়ে একটা গুলি পড়ল মেঝেতে। লোডেড।

উঠে বসেছিল ওয়ালী আহমেদ। নাক-মুখের ওপর রানার বুটের এক লাথি খেয়ে শুয়ে পড়ল আবার। থুক্‌ করে দুটো রক্ত মাখা ভাঙা দাঁত বের করে ফেলল মুখ থেকে। তারপর জ্ঞান হারাল। লঞ্চটা চলতে আরম্ভ করেছে। ঘরের মধ্যে দু'জন এবং দরজার কাছে একজন স্যাঙাত পড়ে আছে জ্ঞান হারিয়ে। বাকি দু'জন কেবিন থেকে বেরিয়ে বোধহয় সংবাদ দিয়েছে অন্যান্যদের। দ্রুত সরিয়ে নেবার চেষ্টা করছে ওরা লঞ্চটাকে ঘাট থেকে। একবার ইয়টে পৌঁছতে পারলে আর রক্ষা নেই রানার।

ওয়ালী আহমেদের একটা পা ধরে হিড় হিড় করে টেনে কেবিন থেকে বের করে ডেকের ওপর আনল রানা। রাইফেলটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে ঝুলিয়ে নিল কাঁধে। গলার ফাঁসটা খুলে ওয়ালী আহমেদের গলায় পরাল। তারপর বেঁধে ফেলল ওকে রেলিং-এর সঙ্গে ছাগলের মত।

কয়েক পা এগোতেই সারেংকে দেখা গেল।

'লঞ্চ ঘুরাও।'

চমকে উঠেই পালাতে যাচ্ছিল সারেং—পিস্তলটা দেখে থেমে গেল। ঘুরিয়ে দিল লঞ্চ। ঘাট থেকে অল্পদূরেই গিয়েছিল, ফিরে চলল আবার সেটা ঘাটের দিকে।

চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখল রানা। আর লোকগুলো কোথায় গেল? কোন্ দিক থেকে আক্রমণ আসবে এবার?

নড়েচড়ে উঠল ওয়ালী আহমেদের দেহটা। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে সে।

'খবরদার! এক ইঞ্চি নড়েছ কি খতম করে দেব।' বলল রানা সারেং এবং ওয়ালী আহমেদকে লক্ষ্য করে। চোখ মেলে চাইল ওয়ালী আহমেদ। চারদিকে চেয়ে সবটা পরিস্থিতি বুঝবার চেষ্টা করল সে।

আর গজ পঁচিশেক আছে। হঠাৎ ডান ধারে পায়ের শব্দ শুনে সেদিকে চাইল রানা। পিস্তল হাতে রানাকে দেখে থমকে দাঁড়াল ওরা। সেই দু'জন স্যাঙাত। ভয়ে বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। বিনাবাক্যব্যয়ে মাথার ওপর হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ।

এমনি সময় ঘটল ঘটনাটা। রানা অন্যদিকে চাইতেই বাঁধন খুলে ফেলেছিল ওয়ালী আহমেদ। এবারে তড়াক করে রেলিং টপকে পানিতে গিয়ে পড়ল।

'সার্চ লাইট পানিতে ফেল, সারেং। জলদি।'

হুকুম করল রানা। জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে না পারলে মেরে রেখে যাবে।

জ্বলে উঠল তীব্র আলো। সে আলোয় বিস্মিত হয়ে দেখল রানা খলখল করে হাসছে যেন সাগরের জল। জীবন্ত হয়ে উঠেছে লঞ্চের চারিটাপাশ প্রাণচাঞ্চল্যে।

ব্যাপার কি? প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না রানা। বুঝতে পারল ওয়ালী আহমেদ ডেসে উঠতেই। ভুস্ করে মাথাটা ভেসে উঠল ওর পানির ওপরে।

'বাঁচাও! বাঁচাও!' চিৎকার করে উঠল ওয়ালী আহমেদ ভাঙা গলায়। অবাক হয়ে দেখল রানা ওর সারা মুখ কামড়ে ধরে ঝুলছে আট দশটা ছয় সাত ইঞ্চি লম্বা মাছ। আলো পড়ে চক্‌চক্‌ করছে ওগুলোর রূপোলী পেট।

পিরানহা! সাগরে বেরিয়ে এল কি করে? ওয়ালী আহমেদ আকাশ ফাটিয়ে

চিৎকার করছে। দুই হাত দিয়ে সরাবার চেষ্টা করছে মাছগুলোকে সর্বাঙ্গ থেকে। কিন্তু একটা সরলে দশটা ঝাঁপিয়ে আসছে সেই জায়গায়। সর্বশরীর ছেঁকে ধরেছে ওরা। তিন মিনিটেই শেষ করে ফেলবে।

কিন্তু এল কোত্থেকে ওরা? হঠাৎ রানার মনে পড়ল জিনাতের সেই চাকা ঘুরানোর কথা। মাটির তলা দিয়ে যখন সাগরের সাথে স্টোর-রুমের নিচের ট্যাঙ্কের যোগ আছে, তখন নিশ্চয়ই কোনও এক জায়গায় তারের জাল দিয়ে বেড়া দেয়ার ব্যবস্থাও আছে। জিনাতের ওই চাকা ঘুরানোর ফলে হয়তো সেই জালের বেড়া সরে গিয়ে থাকতে পারে। হয়তো ওই চাকা দিয়েই বেড়া উঠানো-নামানোর ব্যবস্থা করেছিল ওয়ালী আহমেদ। ছাড়া পেয়ে সব বেরিয়ে এসেছে বাইরে।

এবার পাগলের মত সাঁতার কাটতে আরম্ভ করল ওয়ালী আহমেদ তীরে আসার জন্যে। কন্ট্যাক্ট লেন্স থাকায় চোখ দুটো বেঁচে গেছে পিরান্হার ভয়ঙ্কর আক্রমণ থেকে। কিন্তু সারা দেহের জ্বলুনি আর কতক্ষণ সহ্য করা যায়। সমুদ্রের লবণাক্ত পানি লাগলে খাবলে খাওয়া দেহে কেমন জ্বালা করে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সে। এ-ও এক এক্সপেরিমেন্ট।

মৃত্যু-যন্ত্রণায় শেষ বারের মত কেঁদে উঠল ওয়ালী আহমেদ। আর এগোতে পারছে না। রক্তে লাল হয়ে গেছে পানি। কয়েক মুহূর্তের জন্যে জ্ঞান হারিয়ে ডুবে গিয়েছিল—আবার যখন ভেসে উঠল, রানা দেখল নাক-কানের চিহ্নমাত্র নেই সে মুখে। কয়েক সেকেণ্ড রানার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে ডুবে গেল ওয়ালী আহমেদের মুমূর্ষু দেহটা। সেই সাথে পিরান্হার রুপোলী ঝিলিক নেমে গেল সাগরের গভীরে।

কপালের লিখন খণ্ডাবে কে? ঠিকই বলেছিল ওয়ালী আহমেদ।

ঘাটে ভিড়ল লঞ্চ। ইশারা করতেই সারেংসহ তিনজন নেমে গেল আগে আগে। কসম খেয়ে বলল আর লোক নেই লঞ্চে। আবার স্টোর হাউসে ঢুকল ওরা খোলা দরজা দিয়ে। যে ঘরে জিনাত ছিল সেখানে কাউকেই দেখতে পেল না রানা।

এখনও আর্মড় ফোর্সের পাত্তা নেই কেন? অনীতা কি তাহলে আসেনি?

দোতলা বাড়ির পাশ দিয়ে বাইরে বেরোবার গেটের দিকে এগোচ্ছে রানা বন্দী তিনজনকে নিয়ে। হঠাৎ কানে এল: 'হুকুমদার (Who comes there)! হল্ট! হ্যাণ্ডস্ আপ!'

রানাকে 'ফ্রেণ্ড' বলবারও সুযোগ দিল না—ব্যাপার কি? ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল পিল্ পিল্ করে চারপাশ থেকে এরিয়ার মধ্যে ঢুকছে লোহার শিরস্ত্রাণ পরা সশস্ত্র বাহিনীর জোয়ানরা।

সামনের তিনজনের মত রানাও দাঁড়িয়ে গেল হাত তুলে। এমন সময় গেট দিয়ে পাকিস্তান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর করাচি চীফের সঙ্গে ঢুকলেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। তাদের পিছন পিছন ঢুকল সাধু বাবাজী সোহেল। সামনের তিনজনের ভার গ্রহণ করল মিলিটারি।

রানার বিধ্বস্ত চেহারা আর ফোলা হাতের দিকে চেয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন রাহাত খান। অল্প কথায় সব বুঝিয়ে দিল রানা রাহাত খানকে। ফার্স্ট এইডের কথা তোলায় বলল বাইরে লোক আছে তার সঙ্গে যাবে। তারপর সোহেলকে একবার

চোখ টিপে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। রাহাত খান করাচি-চীফের সঙ্গে চললেন স্টোরের দিকে।

এমন সময় ছুটে এসে রানার হাত ধরল অনীতা গিলবার্ট।

'এ কী চেহারা হয়েছে তোমার, রানা! যাক, বেঁচে যে আছ এ-ই বেশি। ভয়ে আমার প্রাণ উড়ে গিয়েছিল একেবারে।'

'শিগগির আমাকে কোনও হাসপাতালে নিয়ে চলো, অনীতা। ফার্স্ট এইড দরকার।'

'নিশ্চয়ই।'

এগোল ওরা গেটের দিকে। হঠাৎ ওপর দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল অনীতা।

'আরে! ছাতের ওপর কে!' আঙুল তুলে দেখাল সে ছাতের দিকে।

অবাক হয়ে সেদিকে চেয়ে দেখল রানা বিশাল এক দৈত্যের ছায়ামূর্তি। গুংগা! ভূত দেখার মত চমকে উঠল রানা গুংগাকে দেখে। চট্ করে রাইফেলটা নামাল কাঁধ থেকে। বুঝল সব পিরান্‌হা সাগরে বেরিয়ে যাওয়ার পরে ফেলেছিল সে ওকে গর্ত দিয়ে পিরান্‌হার ট্যাঙ্কে।

প্রকাণ্ড একটা পাথর তুলেছে গুংগা দুই হাতে মাথার ওপর। বোধহয় এতক্ষণ ছাতে উঠে বসে ছিল সে রানার অপেক্ষায়।

পর পর দুটো গুলি করল রানা আধ সেকেণ্ডের মধ্যে।

ধনুষ্টঙ্কার রোগীর মত বাঁকা হয়ে গেল গুংগার দেহটা পিছন দিকে। তারপর প্রফেশনাল ডাইভারের মত সোজা নেমে এল সে ছাত থেকে মাথা নিচের দিকে করে। মড়াত করে ভেঙে গেল বিশ বছরের দুরমুজ করা গর্দান।

এগিয়ে যাচ্ছিল সেদিকে রানা, হঠাৎ অনীতার এক হেঁচকা টানে থেমে গেল।

গুংগার হাতের তিনমনি পাথরটা হাত থেকে খসে প্রথমে পড়েছিল কার্নিসের ওপর। ওখান থেকে গড়িয়ে সোজা নেমে এল নিচে। ঠিক গুংগার মাথার ওপর এসে পড়ল প্রকাণ্ড পাথর। 'ঠুস্' করে একটা শব্দ করে ফেটে গেল খুলি। মগজ আর তাজা রক্ত ছিটকে এসে লাগল রানা আর অনীতার চোখেমুখে, কাপড়ে।

'সেই পিশাচ, তাই না, রানা! ইট'স আ জায়ান্ট!'

কানের পাশে রাহাত খানের কণ্ঠ শুনে চমকে উঠল রানা। দেখল পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন মেজর জেনারেল রাহাত খান। অনীতার হাতটা ছেড়ে দিল সে চট্ করে।

'জী, স্যার।'

'তা তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যাও, কুইক। কোনও হসপিটালে ফার্স্ট-এইড নিয়ে নাও।'

'সাতদিনের ছুটি দিতে হবে, স্যার,' বলল রানা একটু ইতস্তত করে।

ভুরু কুঁচকে রানা এবং অনীতার মুখের দিকে চাইলেন রাহাত খান। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অলরাইট।'

ঘৃণাভরে চাইল একবার অনীতা গুংগার মৃতদেহের পানে। তারপর এগিয়ে গেল ওরা স্টার্ট দিয়ে রাখা লাল গাড়িটার দিকে।

'তোমার কাছে চিরঋণী হয়ে থাকলাম, রানা,' ফার্স্ট গিয়ার দিয়ে ক্লাচটা ছাড়তে ছাড়তে বলল অনীতা গিলবার্ট।

মৃদু হেসে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, থেমে গেল। অনীতা গম্ভীর। দু'চোখে টলটল করছে দু'ফোটা অশ্রু। রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে আবার বলল, 'চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকলাম। সত্যি, তোমাকে ধন্যবাদ।'

***